চাঁদমামা
এপ্রিল ১৯৭৭
1·25

প্রথম খৃষ্ট ধর্ম্মী রাজা

রোমের রাজা নীরো ছিল অত্যাচারী রাজা। তার আমলে খৃষ্ট ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারেনি। কনষ্টান্টাইনের আমলে রোমে খৃষ্ট ধর্মের প্রচার হয়। তার বিগ্রহ প্রথমে রোমন্ ফরমে ছিল। সেই বিগ্রহের মাথা ও অন্যান্য অংশ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।
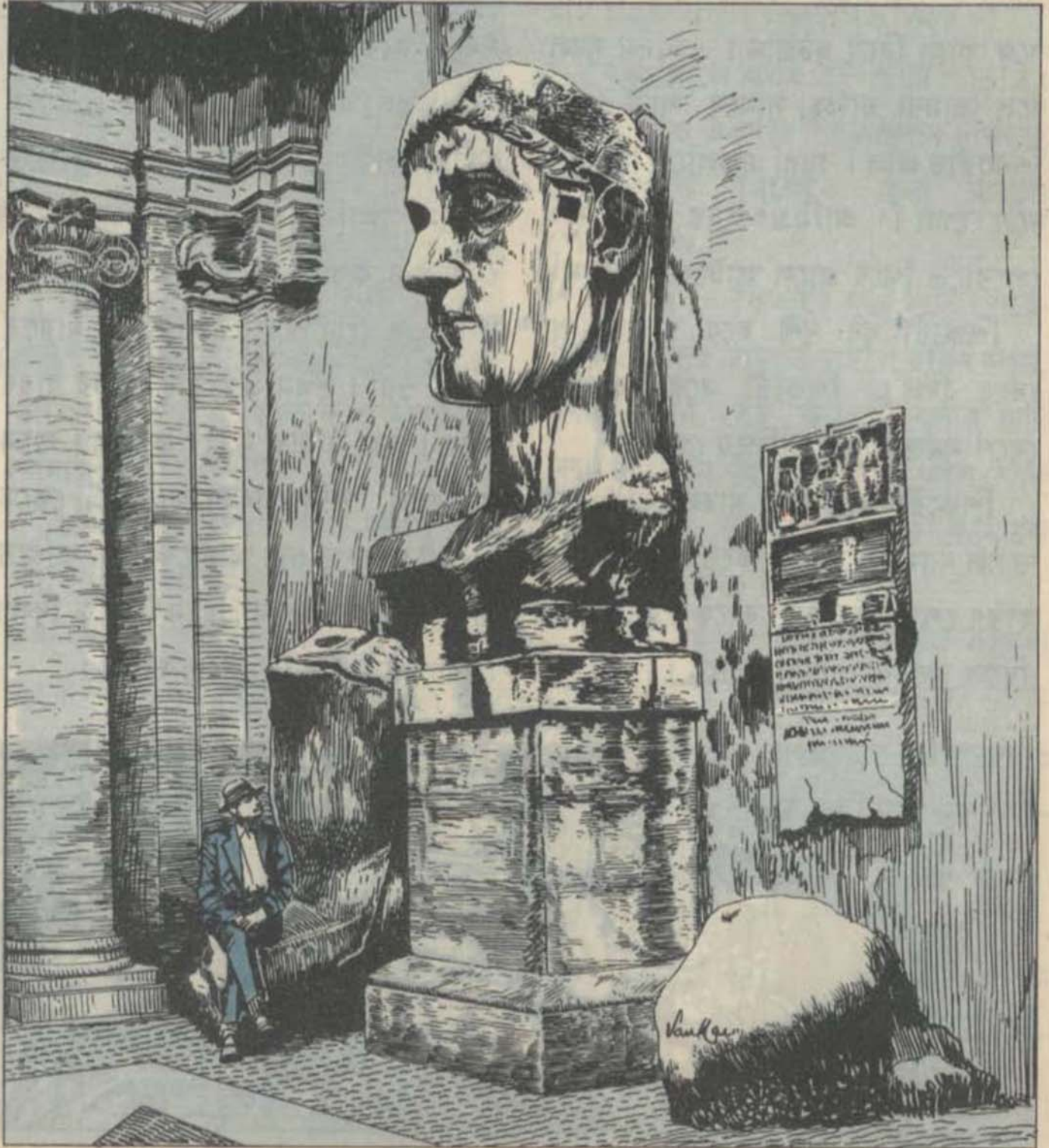
মায়া সরোবর

চোদ্দ

[জলপ্রপাতের বিপদ থেকে জয়শীল, সিদ্ধসাধক ও একটা বেঁটে লোক বেঁচে গেল। তারপর ওরা প্রাণীহত্যাকারী গাছের কবলে পড়তে পড়তে কোনরকমে নিজেদের বাঁচাতে পারল। এই ঘটনার পরে ওরা দেখতে পেল ঐ লোকটার দেশের রাণীকে এগিয়ে আসতে। রাণী তার শত্রুদের বিষয়ে বলছিল এমন সময় একটা পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর......]

পাহাড়ের উপর থেকে যে ভয়ঙ্কর জন্তু পাথরটাকে ওদের উপর ছুঁড়ে ফেলল তার দিকে জয়শীল ও সিদ্ধসাধক তাকিয়ে রইল। ঐ জন্তুর পাশে ছিল একটি মানুষ। জয়শীলের মনে হল পাশের লোক-টাকে যেন কোথায় দেখেছে। এমন সময় ঐ পাথরটা, ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে কুড়িপঁচিশ ফুট দূরে পড়ল।

ঐ লোকটা পাথরটা পড়তে দেখে ভীষণ ভয় পেল। সবাই আর একটু সরে দাঁড়াল। লোকটা জয়শীল ও সিদ্ধসাধককে বলল, "দেখুন ঐ ভয়ঙ্কর নরদানবের সঙ্গে যে লোকটা আছে সে গত দশ বারোদিন ধরে আমাদের ভীষণ জ্বালাচ্ছে। আমাদের চারজন জাতভাই শিকারে গিয়েছিল। সে ওদের মেরে ফেলল। মনে হচ্ছে যে

তরবারি হাতে যে লোকটা আছে সে আমাদের দেশের কেউ নয় তো? ভালো-ভাবে লক্ষ্য করে দেখ তো।” সিদ্ধসাধক কিছু অনুমান করার মত বলল।

লোকটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জয়-শীলের মনে হয়েছিল কোথায় যেন তাকে দেখেছে। কিন্তু নীচে থেকে তাকিয়ে উপরের লোকটাকে ভালোভাবে দেখা যায় না। বিশেষ কারণ না থাকলে, কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না থাকলে কেউ এত-গুলো বন, পাহাড়, নদী পেরিয়ে এতদূর আসতে পারে না।”

কোন সময়ে যে কোনদিন লোকটা ঐ নরদানব নিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর।”

জয়শীল ও সিদ্ধসাধক ওর কথা মন দিয়ে শুনল। শুনে ওদের উপর তাদের-করুণা জাগল। এতগুলো লোক কেন যে ঐ একটি মাত্র নরদানবকে ভয় পাচ্ছে তার কারণ অনুধাবন করল তারা। তারা যত না ঐ নরদানবকে ভয় করে তার চেয়ে দানবের সঙ্গে যে লোকটা আছে তাকে ভয় করে।

“আচ্ছা জয়শীল, নরদানবের পাশে

জয়শীল ভাবছিল এসব কথা। হঠাৎ তার নজরে পড়ল পাহাড়ের উপরের ঐ লোকটা নরদানবকে তরবারি দিয়ে খোঁচা মেরে কি যেন করতে বলছে। খোঁচা খেয়ে দু’একবার লাফ দিয়ে নরদানব একটা পাথর তুলতে গেল কিন্তু পাথরটি বিরাট হওয়ায় সে কিছুতেই তুলতে পারছিল না।

“সাধক, লোকটা আবার একটা বড় পাথর আমাদের উপর ছুঁড়ে ফেলতে নর-দানবকে বলছে। দানবটা তুলতে পারছে না। আমার মনে হচ্ছে লোকটার বুদ্ধি

একটু কম। লোকটা জানে না যে অতবড় পাথর পড়তে দেখে, দিনের আলোতে, যে কোন লোক সরে যাবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাথরটাকে পড়তে দেখে কেউ এমন জায়গায় দাঁড়াবে না যে পাথরটা মাথায় পড়ে।" বলে জয়শীল ঐ রাণীকে বলল, "তোমার প্রজারা শিকার করতে তীরধনুক, বল্লম, ইত্যাদি যা ব্যবহার করে তা এখানে আনতে বল।"

ওরা সাধারণত শিকার করার সময় বল্লম ব্যবহার করে। ওটা ওদের জাতীয় অস্ত্র। ওদের সেনানায়ক বহুকাল আগে একবার একটা বড় বল্লম ও অনেকগুলো তীরধনুক পেয়েছিল। সেগুলোকে সে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। সে যে রেখে দিয়েছে তা রাণী জানত না। তাই হঠাৎ শিকারের অস্ত্রের কথা শুনে ঐ লোকটা অন্যমনস্ক হওয়ার মত ভঙ্গী করে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

তার ঐ ভঙ্গী লক্ষ্য করে সিদ্ধসাধক তাকে বলল, "কি হয়েছে? তুমি এত বড় যোদ্ধা, শিকার আর অস্ত্রের কথা শুনে তুমি যদি এত ভয় পাও, তোমার প্রজারা কি করবে? সেনাপতি হয়েছ যখন যে কোন বিপদের মোকাবিলা করতে তোমাকেই তো এগিয়ে আসতে হবে। তুমি যদি ভয় পাও, মুখ ঘুরিয়ে থাক, তাহলে যুদ্ধ করবে কে? সেনাপতি ভয় পেলে সৈন্যরা তো আরও ভয়ে গুটিয়ে যাবে।"
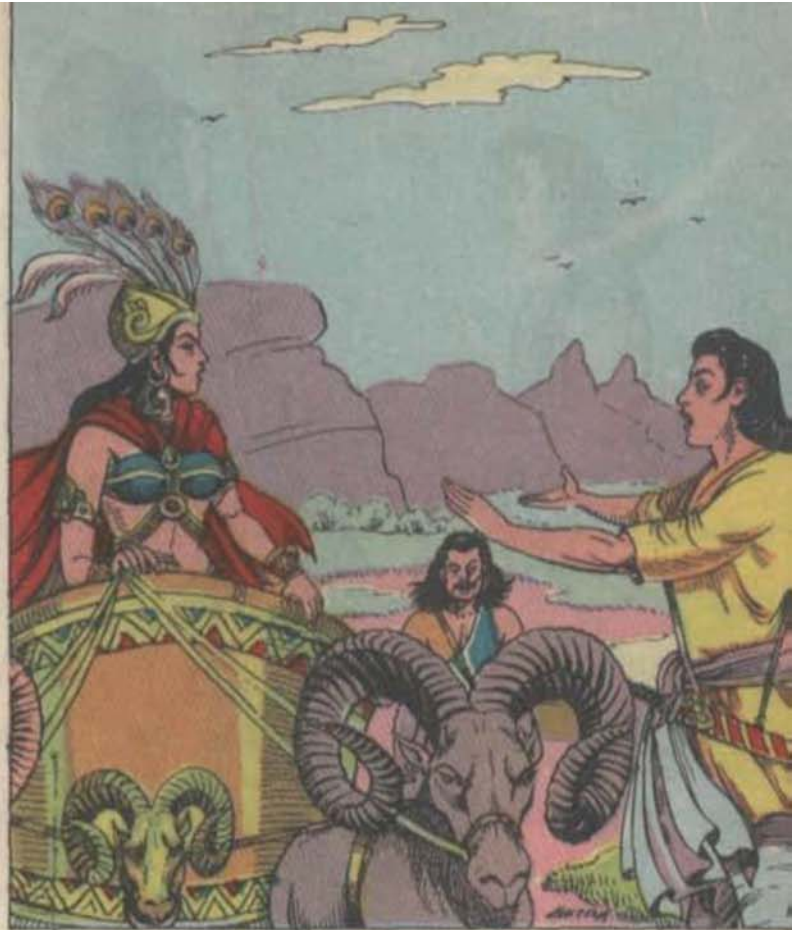
এই প্রশ্ন শুনে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে একবার রাণীর দিকে আর একবার সাধকের দিকে তাকিয়ে শেষে বলল, "মহারাণী, বহু তীরধনুক আছে বটে কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করা আমাদের নিষেধ। এমন কি ছোঁয়াও আমাদের

নিষেধ। তবু আমি নিয়মভঙ্গ করে বনে যতগুলো তীরধনুক পেয়েছিলাম সবগুলো আমার বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছি।”

ওদের রাণী তার কথা শুনে কি যেন বলতে গেল। এমন সময় জয়শীল হাত উপরের দিকে তুলে রাণীকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত করে বলল, “রাণী, তোমার এই লোকটা যে কাজ করেছে তা তোমাদের দৃষ্টিতে যে কতবড় অপরাধ তা আমি জানিনা। তবে এই মুহূর্তে যদি ঐ তীরধনুক আনানো যায়, আমি ঐ নরদানবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারি। অবিলম্বে ঐ তীরধনুক আমার দরকার।”

রাণী অন্য কোন কথা না বলে সেনানায়কের দিকে তাকাল। ওদের সেনানায়ক তৎক্ষণাৎ তীরধনুক আনতে চলে গেল বাড়িতে।

ইতিমধ্যে নরদানব আর একটা বড় পাথর ধরে তুলল। তার কোমরে বাঁধা ছিল লোহার শেকল। একপ্রান্ত বাঁধা ছিল অন্যপ্রান্ত পাহাড়ের উপরের লোকটা ধরে ছিল। নরদানব পাথর ঠিক তুলতে পারছিল না। লোকটা তরবারি দিয়ে তার গায়ে খোঁচা মারছিল। এতে ভীষণ রেগে গিয়ে নরদানবটি লোকটার উপরেই পাথরটা ফেলে দিতে গেল। তৎক্ষণাৎ লোকটা দানবের গলায় তরবারি ধরে গর্জে উঠল।

নরদানবকে শেকলে বেঁধে রেখেও লোকটা এত জোরে চিৎকার করল যে তার চিৎকার পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। জয়শীল এবং অন্যান্যদের কানেও সেই চিৎকার গেল। জয়শীল হেসে বলল, “সিদ্ধসাধক, পাহাড়ের উপরের ঐ লোকটা যে কে এখন আমি চিনতে পেরেছি। সে তোমার

হিরণ্যপুরের লোক নয়। আমাদের অমরা-বতী নগরের লোক। আমি যে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে তোমাদের দেশে গেছি। আর এই বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এ সব কিছুর জন্য দায়ী হল ঐ লোকটা। সে এক সময় আমাদের রাজা রুদ্রসেনের অশ্বারোহী বাহিনীর সেননায়ক ছিল। ওর নাম কৃপাণজিৎ।"

এই কথা শুনে সিদ্ধসাধক অবাক হয়ে বলল, "জয়শীল, এ তো অদ্ভুত ব্যাপার! কোথায় তোমার অমরাবতী, আর এখন আমরা কোথায় আছি। তাহলে এখন তুমি কি করবে ভাবছ?"

জয়শীল কিছুক্ষণ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, কি যেন ভেবে বলল, "সিদ্ধ-সাধক, ঐ নরদানবকে যেভাবে মারছে কৃপাণজিৎ তাতে আমি তাকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে পারি না। তবে আর একটা দিকও লক্ষ্য করার মত, এত অত্যা-চার নরদানব শেষ পর্যন্ত সহ্য নাও করতে পারে। রেগে গিয়ে সে কোমরের শেকল ছিঁড়তে পারে। এমন কি ঐ পাথর নিয়েই কৃপাণজিতের উপর ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে!"

জয়শীলের কথা শেষ হতে না হতেই তীরধনুক এসে গেল। সমস্ত তীরধনুক-

জয়শীলের পায়ের কাছে রেখে দিল ওরা। জয়শীল পরীক্ষা করে দেখল সেগুলো। বেছে বেছে ছটা তীর সে হাতে তুলে নিল।

সিদ্ধসাধক ঐ তীরগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "জয়শীল, তোমার শত্রু কৃপাণজিৎ এবং নরদানবকে এই তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে চাইছ ?"

এই প্রশ্ন শুনে জয়শীল হেসে বলল, "সাধক, নীচে থেকে পাহাড়ের উপরের ঐ দুজনকে তীর দিয়ে মেরে ফেলা কি অত সহজ ? দেখতে তো পাচ্ছ, তীরগুলো মামুলি ধরণের। এ তো আর ব্রহ্মাস্ত্র আর নাগাস্ত্র নয় যে যেখান থেকেই মারি না কেন লক্ষ্যভেদ হবেই।"

এমন সময় পাহাড়ের উপর থেকে বিচিত্র ধ্বনি শোনা গেল। পাথরটা নিয়ে নরদানব কৃপাণজিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। সে ওকে মারতে চাইছে আর কৃপাণজিৎ তরবারি দিয়ে নরদানবকে মেরে ফেলতে চাইছে। এমন সময় চারপাঁচটা বেঁটেখাটো লোক দূর থেকে দড়ি ছুঁড়ে ঐ নরদানবকে বেঁধে ফেলল। পাথরটা ফেলে দিয়ে নরদানব বাঁধা অবস্থায় লাফালাফি করতে লাগল।

নরদানবকে বাঁধা অবস্থায় দেখে রাণীর লোক জয়শীলকে মহাউৎসাহে বলল, "এই হচ্ছে সুযোগ! এক্ষুণি মারতে পারলে নরদানবটা মরে যাবে। আর দেরী নয়, এক্ষুণি তীর ছুঁড়ুন।"

ওদের রাণীও মাথা নেড়ে বলল, "আমরা নরদানবের কাছে যে লোকটা আছে তাকে অত ভয় পাইনা। আমাদের ভয় শুধু ঐ নরদানবকে। ঐ নরদানবকে মেরে ফেলতে পারলে ঐ লোকটাকে আমরা দুদিনেই জব্দ করতে পারব।

তাকে এমন শিক্ষা দেবো যে তার অনুচররা ভয়ে পালাবে।"

জয়শীল চিৎকার করে বলল, "ওহে নীচ কৃপাণজিৎ, তাকিয়ে দেখ, আমি জয়শীল। এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

জয়শীলের চিৎকার পাহাড়ের উপরের লোকের কানে গেছে বলে মনে হল না। কৃপাণজিৎ নরদানবের কোমরে বাঁধা শেকলটাকে একদিকে টেনে রেখেছিল অন্যদিকে ওর সঙ্গীরা নরদানবকে ভালোভাবে বেঁধে ফেলার চেষ্টা করছিল।

জয়শীল কিছুক্ষণ ভেবে রাণীকে বলল, "রাণী, আমার একটি তীর শত্রুপক্ষের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই আক্রমণ করতে এগিয়ে আসবে। ওদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি না থাকলে কিন্তু বিপদে পড়তে হবে।"

এই কথার জবাবে রাণী তার সেনাবাহিনীর দিকে তাকাল। ওরা ততক্ষণে হাতে বল্লম নিয়ে বুঝিয়ে দিল যে ওরা প্রস্তুত। ওদের সেনাপতি জয়শীলকে বলল, "আপনি তীর ছুঁড়তে পারেন। আমাদেরশত্রুদের গায়ে দু'একবার বল্লমের আঘাত লেগেছে। কিন্তু তীর বিঁধলে যে কি হয় তা তারা জানে না। একবার আপনার তীর গিয়ে ওদের একজনের

গায়েও যদি বেঁধে, দেখবেন ওরা চঞ্চল হয়ে উঠবে। ওরা হয়ত জীবনে তীর দেখেনি। শরীরে একবার ঠিকমত তীর বিঁধে গেলে, যার গায়ে বেঁধে তার আর কিছু করার থাকে না। ওরা ঘাবড়ে গিয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করবে। কেউ কেউ পালাবে। আমাদের সেনাবাহিনী লুকিয়ে থাকবে। যে যাকে যেখানে পাবে সে তাকে সেখানেই শেষ করে ফেলবে। প্রয়োজন হলে আগুন লাগিয়ে দেবে।"

"সেনাপতি, তোমার কথা শুনে যুদ্ধ করার উৎসাহ পাচ্ছি। তোমার কথায় এবং কাজের মধ্যে মিল থাকে তো? থাকলেই ভালো। তবে তুমি হয়ত সকলের কথা ভাবতে গিয়ে নরদানবের কথা ভুলে গেছ। নরদানব যেদিক দিয়ে যাবে সেদিক থেকে কি তোমার সেনাবাহিনী তার পথ আগলাতে পারবে? পারবে তাকে বন্দী করতে? যাই হোক, পারুক আর নাই পারুক, তোমাদের শক্তি যাচাই করার ইচ্ছে জাগছে।" জয়শীল বলল।

সিদ্ধসাধক সঙ্গে সঙ্গে শূল তুলে বলল, "জয়শীল আর দেরী নয়। এই হল উপযুক্ত সময়। নরদানব দড়ি ছিঁড়ে ওদের একজনকে ধরে ফেলেছে। ওরা সবাই ঘাবড়ে গেছে। শত্রু যখন ঘাবড়ে যায় তখনই তাকে আক্রমণ করা উচিত।"

পরক্ষণেই জয়শীল নরদানবের দিকে তীর ছুড়ল। তীর বিদ্ধ হল তার কোমরে। সে আর্তনাদ করতে করতে যে লোকটাকে পেল তাকে ফেলে দিল।

এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে রাণীর সেনাবাহিনী পাহাড়ের উপরের দিকে উঠতে লাগল। (আরও আছে)

ঘরের ছেলে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তুমি একজন মহা-পণ্ডিত। তোমার মত পণ্ডিতকেও দেখছি পরিবেশের দাস হয়ে যেতে। এতে আমি অবাক হচ্ছি। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও সুবর্ণ সুযোগগুলোকে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ তোমাকে এক অরণ্যবাসী বীর যুবকের কাহিনী বলছি। তার নাম বীরু। এই কাহিনী শুনলে তোমার পথ চলার পরি-শ্রমও কমে যাবে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ

বেতাল কথা

দেশ এগিয়ে চলেছে

সকলের জন্য আরও বেশি খাদ্য

এ বছর খাদ্যের পরিমাণ হবে রেকর্ডসৃষ্টিকারী—এই পরিমাণ 114 মিঃ টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারতের সরকারী খাদ্য বন্টন ব্যবস্থাটি সুসংগঠিত করা হয়েছে। এটি এখন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রম আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে

davp 75/456

প্রাচীনকালে কামরূপ দেশের রাজা ছিল মলয়সেন। তার ছেলেমেয়ে ছিল না। বয়সও তার হয়ে গিয়েছিল। উত্তরাধী-কারী কেউ না থাকায় ঐ দেশটিকে ছলে বলে কৌশলে দখল করার চেষ্টা অনে-কেই করেছিল। বহুবার তাকে মেরে ফেলার চক্রান্তও হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত মলয়সেন প্রত্যেকবারই বেঁচে গিয়েছিল। কারা যে ঐ চক্রান্ত করছিল তা সঠিকভাবে খোঁজ করাও মলয়সেনের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই যখন অবস্থা তখন পূর্বদেশ থেকে একটি সাদা বাঘ ঢুকে যখন তখন যাকে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলতো। এই খবর পেয়ে মলয়সেন ঐ বাঘ মারার জন্য বেরিয়ে পড়ল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাঘকে পাওয়া গেল না। রাজার সঙ্গে ছিল দু'জন দেহরক্ষী। ওরা হঠাৎ একই সময়ে তরবারি তুলে রাজাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করল। এই অত-র্কিত আক্রমণের জন্য রাজা প্রস্তুত ছিল না। তবু তরবারি তুলে তাদের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করল মলয়সেন।

দুজন দেহরক্ষীর বিরুদ্ধে একা বৃদ্ধ মলয়সেন পারবে কেন? বেশ বোঝা যাচ্ছিল রাজার মৃত্যু ওদের হাতে নিশ্চিত। এমন সময় এক অরণ্যবাসী যুবক এসে একজন দেহরক্ষীকে মেরে ফেলল। তাকে মেরে ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা ও ঐ যুবকের আক্রমণের ফলে অন্য দেহরক্ষীও মারা পড়ল।

ঐ যুবক ছিল অরণ্যবাসী ডাকাতদের সর্দারের ছেলে। তার নাম বীরু। বীরুর বাবা ছিল শিকারে ওস্তাদ। রাজভক্তির জন্য যে বীরু মলয়সেনকে বাঁচিয়েছিল তা

নয়, সে লক্ষ্য করেছিল ছুজন যুবক মিলে একজন বৃদ্ধের উপর আক্রমণ করছে। ঐ দৃশ্য দেখে তার ভীষণ রাগ হয়েছিল। এটা মলয়সেন জানত না। সে যুবকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার সঙ্গে রাজধানীতে যেতে বলল। রাজধানী বস্তুটা যে কি ধরণের তা দেখার ইচ্ছে জেগেছিল বীরুর মনে। তাই সে যেতে রাজী হল।

রাজধানীতে পৌঁছানোর পর মলয়সেন বলল, "দেখ বীরু, আমাকে অনেকবার অনেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। আমার ছেলেপুলে না থাকায় সবাই চাইছে সিংহাসনে বসতে।"

খেতে বসে ছুগাল খেতে না খেতেই মলয়সেনের শরীর খারাপ হল। কারণ ঐ খাদ্যে বিষ মেশানো ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজবৈদ্য ও প্রধানমন্ত্রী ছুটে এল। বৈদ্যের ওষুধে কোন কাজ হল না। মলয়সেন বীরুকেই নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঘোষণা করে মারা গেল।

চোখের পলকে যা ঘটে গেল তাতে বীরু অবাক হল। যা দেখছে যা শুনছে সবই তার কাছে নতুন। তার ইচ্ছে করল তক্ষুণি পালাতে। কিন্তু পরক্ষণেই তার আগ্রহ হল রাজাকে কে বিষ দিয়েছে তা জানার।

সিংহাসনে বসার পর বীরুকেও মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রত্যেকবারই বিপদের হাত থেকে সে বেঁচে যেতে লাগল।

ঠিক ঐ সময় দেশের চারদিকে ডাকাতি শুরু হল। বীরু বুঝতে পেরেছিল কারা ঐ ডাকাতি করছে।

কিছুদিন পরে সেনাপতি বীরুর কাছে এসে বলল, "মহারাজ, একজন ডাকাতকে

আমরা ধরতে পেরেছি। আপনার নির্দেশ পেলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি।”

বীরু কারাগারে এসে অপরাধীকে দেখতে চাইল। বীরুকে দেখেই আনন্দে ঐ ডাকাতের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঐ ডাকাতটি ছিল বীরুর দলের ডাকাত। মাঝরাত্রে বীরু তার ডাকাত সঙ্গীকে মুক্ত করে অরণ্যে পালিয়ে গেল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, “রাজা, বীরু রাতারাতি সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন? তাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছিল বলে? না কি সে বুঝেছিল যে দেশ শাসন করার ক্ষমতা তার মধ্যে নেই? রাজাকে কে বিষ দিয়েছে তা কি সে জানতে পেরেছিল? ডাকাতকে বীরু দিনের বেলায় মুক্ত করল না কেন? আমার এই প্রশ্নের সমাধান জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।”

বেতালের প্রশ্নের জবাবে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, “বীরুর উপর হত্যার চক্রান্ত চলছিল বলে সে ভয় পায়নি। তার দলের লোককে কারাগারে দেখার পর এক সমস্যা দেখা দিল। রাজা হিসাবে ঐ ডাকাতকে মুক্ত করলে সারা দেশে খবর ছড়িয়ে পড়ত যে রাজা ডাকাতকে মুক্ত করেছে। ফলে অপমানিত হয়ে একদিন তাকে সিংহাসন ছাড়তে হত। সিংহাসন নিয়ে যখন অনবরত চক্রান্ত চলছিল তখন কে বা কারা তা করছে তা জানার কৌতুহল বীরুর মধ্যে কমে গেল। রাজধানীর জীবনের চেয়েও তার কাছে অরণ্যের জীবন বেশী প্রিয় ছিল।”

রাজা বিক্রমাদিত্যের এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল সব নিয়ে পালিয়ে গেল ঐ গাছে।” (কল্পিত)

নিরক্ষর মানুষ

সাতসকালে মুরারী আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে মুখ ধুচ্ছিল। এমন সময় গ্রামের বয়স্ক লোক ত্রিলোচন ছুটতে ছুটতে মুরারীর সামনে এসে দাঁড়াল।

"কি হয়েছে কাকা? হাঁপাচ্ছ কেন? সাতসকালে ছুটে এলে, ব্যাপার কি?" মুরারী জিজ্ঞেস করল।

ত্রিলোচন কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বসে পড়ে বলল, "আর বাবা আমার কপাল পুড়েছে।"

"কি হয়েছে? চুরি হয়েছে নাকি?" মুরারী জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ চুরিই বলতে পারো বাবা। তবে একেবারে দিন-দুপুরে চুরি। গাঁয়ের নামকরা লোক কিশোরী ঠাকুর এই চুরি করেছে।" ত্রিলোচন বলল।

"কি হয়েছে খুলে বলুন?" মুরারী জিজ্ঞেস করল।

"গত বছর কিশোরীর কাছে দুশো টাকা নিয়েছিলাম। একটা কাগজের উপরে সে আমার বুড়ো আঙুলের ছাপ নিয়েছিল। লেখাপড়া তো জানিনা, কাগজে কি লেখা ছিল পড়তে পারিনি। ঐ দুশো টাকার পরিবর্তে এক বিঘে জমি বন্ধক রেখেছিলাম। কাল সন্ধ্যের সময় হঠাৎ দেখি দুটো লোক এসে হাজির। ঐ জমিটা নাকি দখল নিতে এসেছে। আমাকে যে কাগজ দেখাল তাতে তার বন্ধুদের সই আছে। শোনা কথা, আমি তো আর পড়তে পারি না; ওরা নাকি

এ. সি. সরকার (যাদু-সম্রাট)

সব সাক্ষী।" ত্রিলোচন বলল।

"তার জন্য অত ভাববেন না কাকা। আপনার একটা টিপ সই নিয়ে ওরা জমি হাতিয়ে নিতে পারবে না। তবে এই বয়সে আপনাকে ছোটাছুটি করতে হবে। লেখাপড়া না জানার ফলে এই গ্রামের নিরক্ষর বহু মানুষ দিনের পর দিন ঠকছে কাকা। শুধু কিশোরী নয়, অনেকেই ঠকাচ্ছে। যাই হোক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ ব্যাপারে যা করার আমি করছি।" মুরারী এই কথা বলে ত্রিলোচনকে সান্ত্বনা দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

মুরারী ল পাশ করেছে। শহরে প্রাকটিস করে। সপ্তাহে একদিন গ্রামের বাড়িতে আসে। তার গ্রামের নাম কমলপুর। মুরারীর বাড়িতে মা বাবা আছেন। কমলপুরের প্রায় সবাই চাষী। লেখাপড়া জানে না। ওদের কথা মাঝে মধ্যে মুরারী ভাবে। কিন্তু ভেবে কূল পায় না।

এই লেখাপড়া না জানা লোককে দিনের পর দিন সুদের কারবারী ও মহাজনরা যে কিভাবে শোষণ করছে তা সে চোখের সামনে দেখেছে। লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা একবার করেছিল কিন্তু গ্রামের চাষীদের মতে, "মা সরস্বতী চান না যে আমাদের লেখাপড়া হোক। তিনি
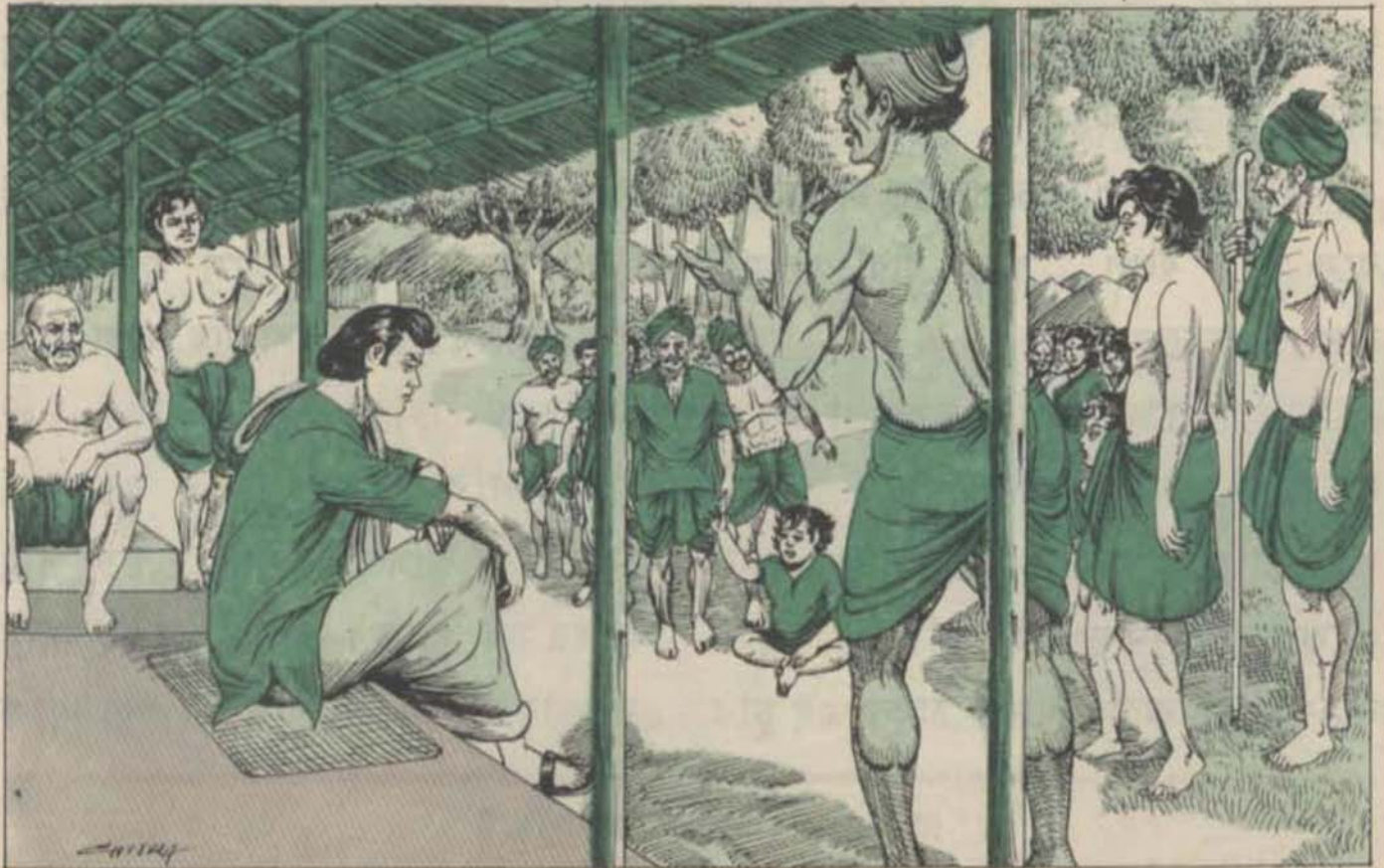
যদি চাইতেন তাহলে বাচ্চা বয়সেই আমাদের লেখাপড়া হয়ে যেত। এখন তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি আর আমাদের লেখাপড়ার কি দরকার?” বয়স্ক চাষীদের এই কথা শুনে মুরারী আর তেমন উৎসাহ পেল না।

অনেকদিন পরে ত্রিলোচনের এই ঘটনা শুনে মুরারীর মনে নতুন করে ইচ্ছে জাগল গ্রামবাসীদের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তার করা। মনে মনে ঠিক করল যেভাবেই হোক গ্রামের মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতেই হবে। কিন্তু গ্রামবাসীদের মুখে ঐ এক কথা, “দেবী সরস্বতী চান না যে আমাদের লেখাপড়া হোক।”

মুরারী ভাবল, মা সরস্বতী এদের কানে নিশ্চয় বলে যাননি যে লেখাপড়া তোমাদের হোক এটা আমি চাইনা। এই সব অদ্ভুত চিন্তাধারাকে দূর করতে হলে অদ্ভুত কোন কাণ্ড ঘটাতে হবে। এই সমস্যার সমাধান করতে মুরারী তার এক যাদুকর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করল। তার পরামর্শ নিয়ে সে বাড়ি ফিরল।

অনেকগুলো কাগজের টুকরোতে নেবুর রস দিয়ে “চাই” শব্দটি মুরারী লিখে ফেলল।

কমলপুর গ্রামের পাশ দিয়ে সরস্বতী
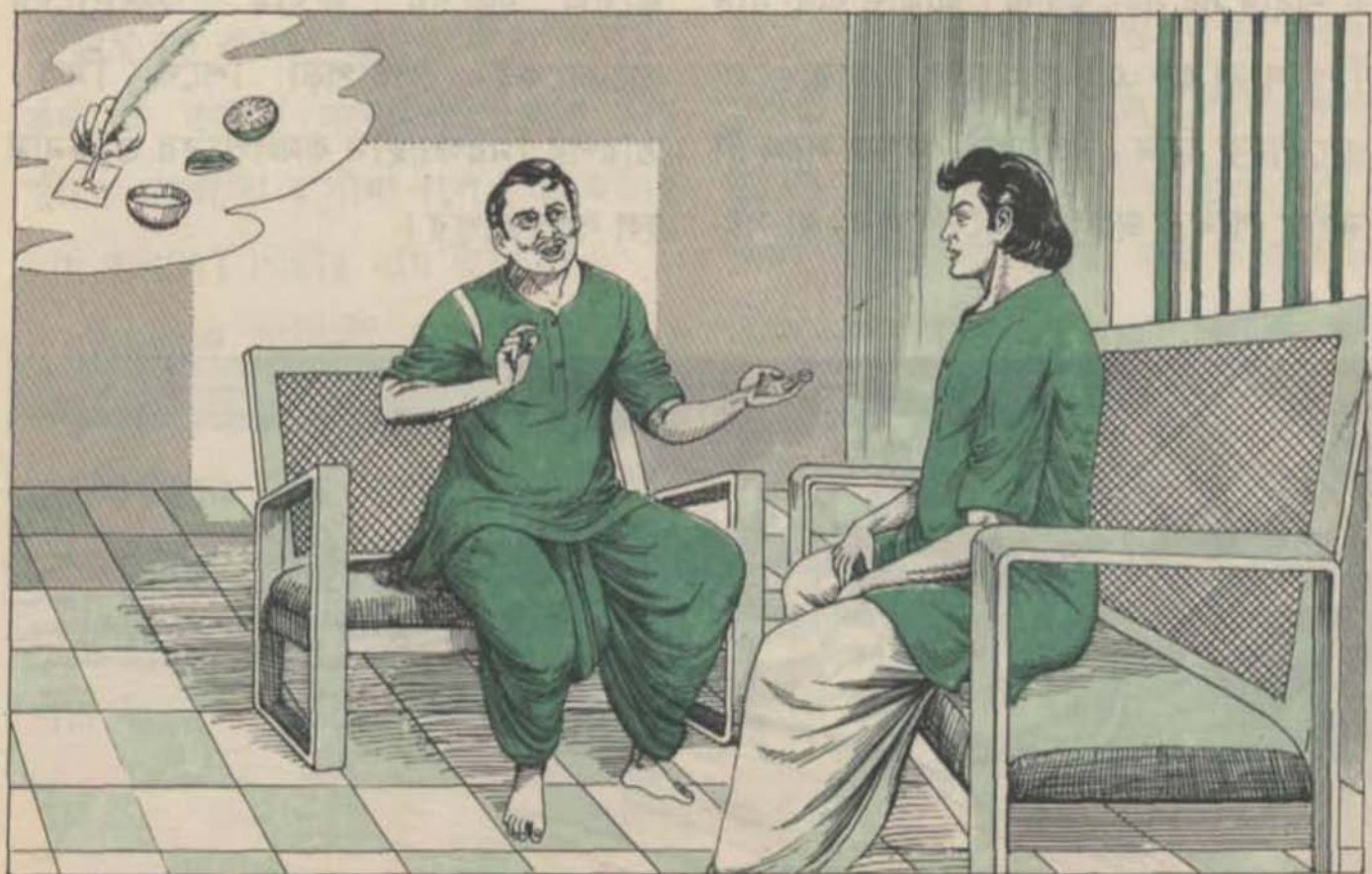
নদী প্রবাহিত হচ্ছিল। এই নদীর জল গ্রামের মানুষ প্রতিটি পবিত্র কাজে ব্যবহার করছিল। মুরারী ঠিক করল, নদীর জলের প্রতি মানুষের এই অন্ধবিশ্বাসকে ব্যবহার করতে হবে।

সে একদিন বয়স্ক চাষীদের ডেকে বলল, "আপনারা বলেন মা সরস্বতী চান না যে আপনাদের লেখাপড়া হোক। কি করে জানলেন ? সরস্বতী কি কারুর সামনে হাজির হয়ে বলে গেছেন ? নিশ্চয় নয়। তবে এটা আপনাদের বিশ্বাস। আর কোন বয়সকে বাচ্চা বয়স বলছেন ? লেখাপড়ার আবার বয়স কি ? মা সরস্বতী আশীর্বাদ সব সময় থাকে। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় এই কাগজের টুকরোগুলো প্রত্যেকে নিন। প্রতিটি কাগজ সরস্বতী নদীর পবিত্র জলে চুবিয়ে বলুন, মা সরস্বতী, তুমি কি চাও যে আমাদের লেখাপড়া হোক। জবাবে মা সরস্বতী ঐ কাগজে যা লিখে দেবেন তাই হবে।"

মুরারীর কথা গ্রামবাসীদের মনে ধরল। গ্রামের ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী, বুড়ো-বুড়ি সবাই এক একটা কাগজ নিয়ে সরস্বতী নদীর জলে চুবিয়ে আবার তুলল। প্রত্যেকের কাগজে লেখাছিল, "চাই"।

এই চাই শব্দটি দেখে গ্রামবাসীদের বিশ্বাস হল যে মা সরস্বতী চান যে তাদের লেখাপড়া হোক। সবাই আগ্রহী হল।

শেষ পর্যন্ত গ্রামের মানুষকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য একটি সমিতি গঠিত হল। কয়েক বছরের মধ্যেই কমলপুরের প্রত্যেকেই লেখাপড়া শিখে নিল। তারপর নিরক্ষরহীন কমলপুরের ডাকনাম হল সরস্বতীপুর।

টাঁকার চাহিদা

ছেলেটির নাম শ্রীমন্ত। সে ছিল মেধাবী। তার বাবা মা ছিল খুব গরীব। অতি অল্প বয়সেই শ্রীমন্ত তার বাবা-মাকে হারাল। ঐ অনাথ বালককে পাড়ার এক পরিবার খাইয়ে পরিয়ে পড়িয়ে বড় করল। শ্রীমন্ত ঐ পরিবারের কর্তাকে ডাকত মেসোমশাই আর তার স্ত্রীকে ডাকতো মাসীমা বলে। ঐ কর্তার নাম রাখাল। গিন্নীর নাম সাবিত্রী।

শ্রীমন্তকে সাবিত্রী ভালবাসতো না। তার প্রতি তারকোনরকম স্নেহ ছিলনা। সে শ্রীমন্তকে দিয়ে বাড়ির কাজ করিয়ে নিত। রাখালের একটি মেয়ে ছিল। তার নাম সুন্দরী। সে ছিল শ্রীমন্তের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। সুন্দরী ও শ্রীমন্ত একসঙ্গে লেখাপড়া করতে যেত। ওদের দুজনকে দেখে লোকে বলাবলি করত, "বাচ্চা রাধাকৃষ্ণ যাচ্ছে।" শ্রীমন্তের কিছু হলে সুন্দরীর ভয় করত। ওর অসুখ করলে সুন্দরীর দুশ্চিন্তা হত।

দুজনে বড় হল। শ্রীমন্ত লক্ষ্য করল, সুন্দরী তাকে এড়িয়ে চলে। পরে বুঝল, মায়ের ভয়ে সে তাকে এড়িয়ে চলে। সুন্দরীর এই আচরণের জন্য তার উপর শ্রীমন্তের রাগ হল না। সে তাকে ভুল বুঝল না।

একবার সুন্দরীর কাঁধে হাত দিয়ে শ্রীমন্ত কি যেন বলছিল এমন সময় তার মা এসে শ্রীমন্তকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলল, "আজ বাদে কাল মেয়ের আমার বিয়ে

নীলরতন সর্দার

হবে। তোকে খাইয়ে পরিয়ে বাড়িতে রেখেছি বলে কি তুই এত বাড় বেড়ে যাবি? তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। ফের যদি কোনদিন দেখি তো তোকে বাড়ি থেকে বের করে দেবো।"

"সবাই বলাবলি করছে, সুন্দরীর সঙ্গেই নাকি আমার বিয়ে হবে।" শ্রীমন্ত সবিনয়ে বলল।

"লোকে বলাবলি করবে না কেন? লোকে তো চায়, আমার মেয়ে জলে ডুবুক। লোকের কথা লোকে বুঝবে, আমার যা বলার আমি তোকে বলে দিয়েছি। আর কোনদিন মেয়ের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলবি না।" সাবিত্রী কর্কশ স্বরে বলল।

সেদিন রাত্রে রাখাল বলল, "শোন শ্রীমন্ত, তোমাকে আদর আব্দার দিয়ে আমি এখন দেখছি ভুল করেছি। শুনলাম তুমি নাকি সুন্দরীকে বিয়ে করার কথা বলেছ। তোমার কি আছে? চাল নেই, চুলো নেই, তুমি কোন্ সাহসে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? নিজের পেট চালানোর মুরোদ নেই তোমার, তুমি আবার বিয়ে করতে চাইছ? সংসার কিভাবে চলে জান? টাকা পয়সা ছাড়া সংসার চলে না।"

"আজ্ঞে, সুন্দরী আমাকে আর আমি সুন্দরীকে—" কথাটা শেষ হওয়ার আগেই শ্রীমন্তকে ধমক দিয়ে থামিয়ে রাখাল বলল, "আমি জিজ্ঞেস করছি তোমাদের পেট চলবে কি করে? স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে তো দোকানের জিনিস কিনতে পারা যায় না। টাকাই হচ্ছে আসল, টাকা না থাকলে কোন কিছুর দাম নেই।"

শ্রীমন্ত কিছুক্ষণ ভেবে কি যেন প্রতিজ্ঞা

করে বলল, "ঠিক আছে মেসোমশাই, আমি গায়ের রক্ত জল করেও টাকা রোজগার করে ফিরব। আমি এক বছরের মধ্যে অনেক টাকা রোজগার করে ফিরে আসব। তবে আপনি এই এক বছরের মধ্যে সুন্দরীর বিয়ে অন্য কোথাও দেবেন না। এই এক বছরের মধ্যে আমি না ফিরলে আপনার যা ইচ্ছা করবেন।"

রাখাল মনে মনে বলল, "তুমিও এক বছরের মধ্যে টাকা করেছ আর আমিও তোমার মত হতভাগার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব।"

শ্রীমন্ত কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়ল পথে। দিন যায়, রাত যায়, কত খোঁজে, কিন্তু কাজ জোটে না তার কপালে। কয়েকদিন পরে যে কাজ জুটল তাতে তার কোনরকমে খাওয়াপরা চলল। জমাতে সে পারল না। এইভাবে কিছুদিন চলার পর তার নিজের উপর ধিক্কার এবং বিরক্তি জাগল।

একদিন রাত্রে সে অন্যের দাওয়ায় ঘুমোচ্ছিল। মাঝ রাত্রে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দুজন লোককে ফিসফিস করে কথা

বলতে বলতে সেদিকে আসতে দেখল।

শ্রীমন্ত তৎক্ষণাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওরা ছিল চোর। ওদের একজন বলল, "পথ ছাড়। তোমার কি প্রাণের ভয় নেই?"

শ্রীমন্ত হঠাৎ তার গালে একটা ঘুষি মারল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। তা দেখে অন্য চোর ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

"বাঁচতে যদি চাও তাহলে বল এসব জিনিসপত্র টাকাপয়সা কোত্থেকে পেলে? তোমরা নিশ্চয়ই চুরি করেছ? তোমাদের

জেমসের মজার আসর
১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!
এই পাঁচটি চিত্রের মধ্যে কোন্‌টি খালি জায়গায়
মানানসই হবে?
?
1 2 3 4 5
Cadbury's
MILK CHOCOLATE
GEMS
শিগ্‌গির!
তোমাদের উত্তর আর
সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্‌ জেমসের
একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক
উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।
বড় হরফে শুধু ইংরেজিতে তোমাদের
উত্তর আর নাম ও ঠিকানা লিখবে।
এই ঠিকানায় পাঠাও:
"Fun with Gems" Dept. B–27
Post Box No. 56, Thane 400 601.
উত্তর পৌঁছবার শেষ তারিখ:
30–4–1977
রঙ বেরঙের, চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্‌ জেমস
CHAITRA-C-69 BEN
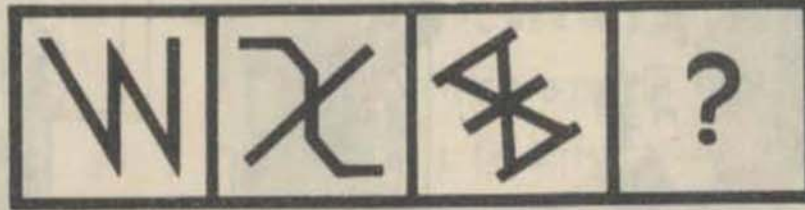
কোন জবাব দেবে না। যারা টাকা জমায় তারা নানাভাবে, নানা ধান্দা করে টাকা জোগাড় করে। আর যারা দিনরাত গায়েগতরে খেটে যায় তারা সারাজীবন খেটেই যায়। সাতপুরুষ ধরে তারা গরীবই থেকে যায়। কিছু মনে করবেন না বাবু, আমি যা বললাম আরও বড় হয়ে আপনিও তা বুঝবেন।"

শ্রীমন্ত কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "টাকা-পয়সা আমিও চাই। দু'চারশো টাকা নয়, দু'চার হাজার দু'চার লাখ টাকা চাই। তোমরা আমাকে তোমাদের দলে নেবে?"

দেখে মনে হচ্ছে চুরি না করে তোমরা এত টাকাপয়সা পেতে পার না। আমি দিনরাত গায়েগতরে খেটে এক পয়সাও জমাতে পারি না, তোমরা পারলে কি করে?" শ্রীমন্ত বলল।

দ্বিতীয় চোর বলল, "কি বলছেন বাবু, গায়েগতরে খেটে কেউ কি টাকাপয়সা জমাতে পারে? যাদের অনেক টাকা-পয়সা আছে তাদের কত আছে জানতে চাইলে হয়ত জানতে পারবেন। কিন্তু কিভাবে তারা অত টাকা রোজগার করেছে তা জানতে চাইলে ওরা আপনাকে

সেই চোর হেসে বলল, "না নেওয়ার কি আছে? আমাদের দল কি কারখানা না আপিস যে চাকরি খালি থাকবে না! আমাদের এই কাজে সবসময় লোকের দরকার হয়। আর আপনার মত সাহসী যুবককে পেলে তো দলের শক্তি বেড়ে যায়। আপনাকে আমাদের দলে পেলে, লাখ কেন, কোটি টাকাও রোজগার হয়ে যেতে পারে। চল আমাদের সঙ্গে।"

শ্রীমন্ত ওদের দলে ভিড়ে গেল। সাহসের সঙ্গে চুরি ডাকাতি করে, কয়েক মাসের মধ্যেই সে ঐ দলের সর্দার হয়ে

গেল। সে তার দলের লোককে সুশৃঙ্খল-ভাবে রাখত।

কয়েকমাস পরে শ্রীমন্তের ইচ্ছে করল সুন্দরীকে দেখতে। তার অনুচরদের মধ্যে চারজন যুবককে নিয়ে সুন্দরীর পাড়ায় পা রাখতেই সে জানতে পারল যে সেই রাত্রেই সুন্দরীর বিয়ে, ভোর রাত্রে লগ্ন।

শ্রীমন্ত সুন্দরীর বিয়ের খবর পেয়ে বিচলিত হল। সে ছদ্মবেশে ছিল। ঐ ভীড়ের মধ্যে ঢুকে বর আর বরের বাপকে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। কারণ ওরা দুজনেই ছিল দাগী চোর।

কি যে করা যায়, কিছুক্ষণ ভেবে, ঠিক করে, শ্রীমন্ত তার অনুচরদের বলে দিল।

এদিকে পুরুতঠাকুরের মন্ত্র পাঠ দ্রুত-গতিতে চলছিল। এমন সময় শ্রীমন্তের অনুচর কৌশলে সুন্দরীকে জানিয়ে দিল যে বাড়ির পেছনের দিকে শ্রীমন্ত তার জন্য অপেক্ষা করছে।

লগ্ন বয়ে গেল কিন্তু বনের পাত্তা ছিল না। এমন সময় বর এবং বরের বাবা যত পারল সোনাদানা পোঁটলা বেঁধে পালালো।

সকালে ঐ বর, বরের বাবা এবং সুন্দরীকে নিয়ে শ্রীমন্ত হাজির হল রাখালের বাড়িতে। রাখাল শ্রীমন্তকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে বলল, "তোমাকে স্বয়ং ভগবান পাঠিয়ে-ছেন। তা না হলে এরা যে কারসাজি করেছিল তাতে আমার সোনাদানা টাকা-পয়সা তো যেতই, মেয়েও আমার জলে ডুবে মরত। সামনের লগ্নেই আমি তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবো বাবা।" সুন্দ-রীকে বিয়ে করে, চুরি ছেড়ে, শ্রীমন্ত আবার সাংসারিক জীবনে ফিরে এল।

সোনা তৈরির কৌশল

সনাতন ও শতদলের মধ্যে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। ওদের দুজনের মধ্যে একমাত্র চিন্তা ছিল সোনা তৈরি করার। সাধু সন্ন্যাসীদের দেখা পেলেই ছুটে গিয়ে ওরা তাকে জিজ্ঞেস করত, "আচ্ছা বাবা, সোনা কিভাবে বানানো যায় তা তুমি জান?"

কয়েক বছর পরে এক সাধু ওদের বলল, "ঐ বিদ্যা আমার গুরু জানেন। উনি, সামনে যে পাহাড়টা আছে, ঐ পাহাড়ের শিখরে থাকেন।" ওরা তৎক্ষণাৎ ঐ সাধুর গুরুর কাছে গিয়ে প্রণাম করে ওদের মনের কথাটি বলল।

ঐ সাধুর গুরু একগাল হেসে বলল, "সোনা যে কিভাবে বানানো যায় তা আমি জানি। কিন্তু দক্ষিণা ছাড়া আমি তো সেই বিদ্যা দান করতে পারি না। পাঁচটি করে সোনার মুদ্রা হাতে নিয়ে তারপর আমি ঐ বিদ্যা শিখিয়ে থাকি। গুরুদক্ষিণা ছাড়া কোন বিদ্যা দান করা যায় না।"

সনাতন ও শতদলের কাছে টাকাপয়সা যা কিছু ছিল সব খরচ করে সোনার মুদ্রা পাঁচটি করে কিনে গুরুকে দিল। গুরু ঐ মুদ্রাগুলো নিয়ে ওদের বলল, "আমি তোমাদের কানে কানে একটি মন্ত্র বলব। মন্ত্রটি কোথাও লিখলে তার প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। একবারের বেশী দুবার বলাও যাবেনা।" বলে গুরু ওদের দুজনের কানে মুখ রেখে কঠিন শ্লোক উচ্চারণ করল।

'বসুন্ধরা'

সনাতন শ্লোকটিকে চটপট মুখস্ত করতে গিয়েও ভুলে গেল। শতদল মুখস্ত করতে পারল। সনাতন গুরুকে বলল, "প্রভু, আমি বোধ হয় সোনা বানাতে পারলাম না।"

গুরু তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "তোমার ভাগ্যে যদি না থাকে তো আমি কি করতে পারি বল। তবে একটা উপায় তোমায় বলে দিচ্ছি, শতদল সোনা বানাতে পারবে। ও যে সোনা আজ বানাবে তা তুমিই পাবে।"

তারপর শতদলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে গুরু বলল, "আজ শুক্লা নবমী। আজকের পরে আগামী শুক্লা নবমীর দিন তুমি সোনা বানাতে পারবে। অর্থাৎ তুমি মাসে একদিন সোনা বানাতে পারবে। তাও একবারের বেশী পারবে না। আমি যা বলছি তা যদি না কর তাহলে মন্ত্রের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে।"

সেখানেই সোনা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল। একটি পাত্রে দুসের দুধ ঢেলে সেই পাত্রটি বালির মধ্যে রেখে তার উপর কয়েকটি পাতা চাপা দিয়ে শতদল মন্ত্র পাঠ করল। তারপর সেই পাতাগুলো সরিয়ে বালির ভেতর থেকে পাত্রটি বের করতেই দেখা গেল পাত্রে ভরে রয়েছে সোনার মুদ্রা। গুরু ঐ মুদ্রাগুলো সনাতনকে দিল। অত সোনার মুদ্রা দেখে সনাতনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সে ভাবল, এই মুদ্রা দিয়েই আমার জীবন সুখে কেটে যাবে।
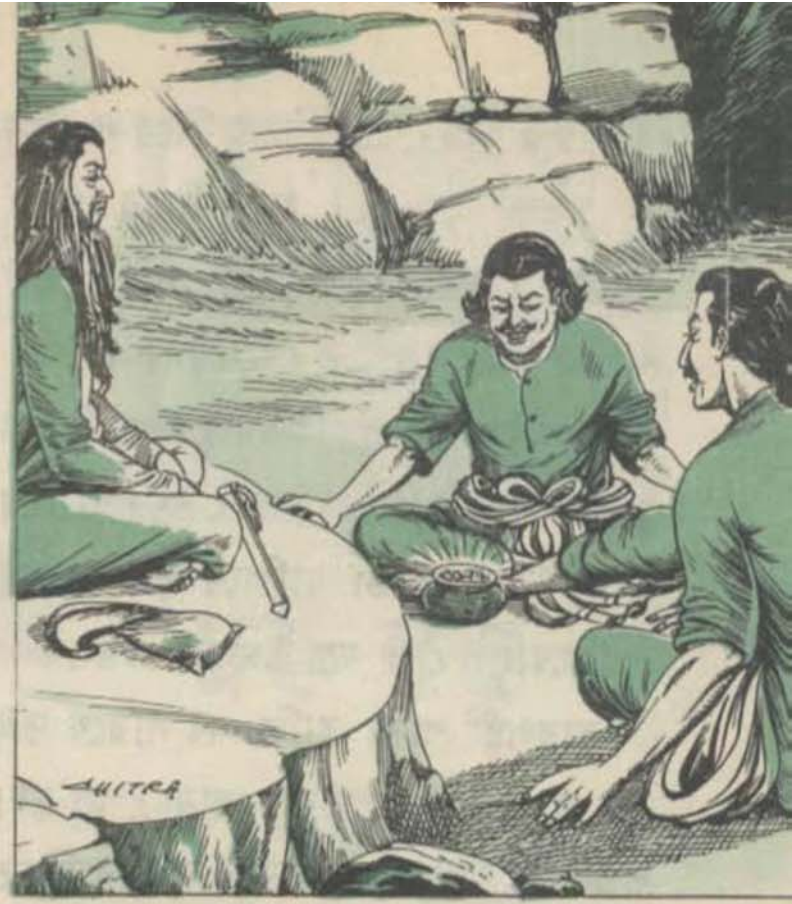
তারপর গুরু ওদের দুজনকে বলল, "আমি হয়ত চিরকাল এখানে থাকব না। তবু যতদিন আছি কোন প্রশ্ন, সন্দেহ জাগালে, সোজা চলে এসো। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে যাব।"

গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সনাতন ও শতদল যে যার বাড়ি ফিরে গেল। সনাতন সোনার মুদ্রা ভরা ঐ পাত্রটি বাড়ির পেছনে পুঁতে রেখে দিল।

একমাস পরে শুক্লা নবমীর দিনে বিরাট দুধের পাত্রটিকে বালির ভেতর ঢুকিয়ে তার উপর পাতা চাপিয়ে গুরু যে মন্ত্র শিখিয়েছিল সেই মন্ত্র উচ্চারণ করল।

তারপর পাতা বালি সব সরিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শতদল সোনা পেল না। শতদল তৎক্ষণাৎ সনাতনের বাড়িতে ছুটে গেল।

সব কথা শুনে সনাতন বলল, "তুমি হয়ত মন্ত্র ঠিকভাবে উচ্চারণ করনি।" তার কথায় শতদলের বিশ্বাস হল না। তার অবস্থা দেখে সনাতন বলল, "তুমি দু সেরের পাত্র নিতে পারলে না? যাক্ দুসের সোনা আমার কি হবে। তুমি অর্ধেক নিয়ে যাও।"

সনাতন মাটি খুঁড়ে পাত্র বের করে দেখে ঐ মুদ্রাগুলো সোনার মত চক্‌চক্ করছে না। ওরা স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গেল। স্বর্ণকার পরীক্ষা করে বলল, "তোমরা কি পাগল হয়েছ? চক্‌চক্ করলেই অমনি সোনা হয়ে গেল।

দুই বন্ধুতে ছুটে গেল সেই গুরুর কাছে। গুরু যেখানে ছিল সেখানে পাথর চাপা দিয়ে রাখা ছিল একটি চিঠি। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, হে শিষ্যগণ, মন্ত্র পড়ে সোনা তৈরি করা যায় না। পরিশ্রম না করে যে কিভাবে সোনা বানানো যায় তা দেখিয়ে দিয়েছি। তোমাদের চেয়ে বোকা লোক খুঁজে তাদের ঠকাতে পারো।

দুই বন্ধু

আমীর ও হোসেনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আমীর ছিল কুঁড়ে, কোন কাজ সে শুরু করত কিন্তু শেষ করতে পারত না। তার আগেই কোন না কোন ঝামেলায় পড়ে যেত। তখন ডাক পড়ত হোসেনের। হোসেন তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করত।

ওরা দুজনে একবার ঠিক করল ব্যবসা করবে। ব্যবসায় অনেক টাকা হবে। টাকা জমিয়ে বিয়ে করবে, সংসার পাতবে। ব্যবসা করার জন্য টাকা চাই। ওদের হাতে টাকা-পয়সা ছিল না। তাই ওরা নিজেদের ঘরবাড়ি বিক্রি করে সেই টাকা ঢেলে ব্যবসা সুরু করে দিল। নানা রকম আতর কিনল। দুজনে আতর নিয়ে দুদিকে বিক্রি করতে গেল।

আমীর গেল পূবদিকে। নতুন শহরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সে বনের পথ ধরে এগিয়ে গেল। সন্ধ্যের সময় সে বনের প্রান্তে পৌঁছাল। সারা দিন পথ চলার ফলে সে ঘেমে গিয়েছিল। ভাবল, আমার গা দিয়ে এত ঘামের গন্ধ বেরুলে আমার কাছে কেউ আতর কিনতে আসবে না। একটু আতর মেখে নিলে সব দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে।

সে একটি বটগাছের নীচে বসে চামড়ার থলে থেকে আতরের শিশি বের করে কিছুটা আতর গায়ে ও কাপড়ে মেখে নিল।

এমন সময় বটগাছ থেকে একটি পেত্নী নেমে এসে বিরাট নারীমূর্তি হয়ে তার

আকবর আলী

সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "কি করছ ?"

আমীর ওর ঐ বিরাট দেহ দেখে বুঝল সে কে। তাই কর্কশ গলায় জবাব দিল, "দেখতে পাচ্ছনা, আতর মাখছি।"

"আমার গায়ে একটু মাখিয়ে দাও।" ঐ পেত্নী বলল।

"তোমার গায়ে আবার মাখিয়ে দিতে হবে ? ইচ্ছে করলে তো তুমি ক্ষুদ্র হয়ে বোতলে ঢুকে যেতে পার। বোতলে ঢুকে যত ইচ্ছা মেখে নাও।" আমীর বলল।

পেত্নী মহানন্দে ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করে ঐ শিশির মধ্যে ঢুকে গেল। আমীর সঙ্গে সঙ্গে বোতলে ছিপি এঁটে সেটি থলের ভেতরে রেখে দিল। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগেই সে একটি গ্রামে পৌঁছে গেল।

আমীর ঐ গ্রামে ঢুকে লোকের কাছ থেকে জানতে পারল রাজধানী বেশী দূরে নেই। রাজধানীতে সাজো সাজো রব। দুচার দিন বাদেই রাজকন্যার বিয়ে। এই খবর পেয়ে আমীর ভাবল, রাজধানীতে যাওয়াই ভালো। একবার যদি রাজকন্যার কাছে আতর বিক্রি করতে পারি তাহলে আমার ব্যবসার পয়সা খায় কে ? রাজকন্যার কাছে আতর বিক্রি করতে পারলে চারজনের কাছে বুকঠুকে বলতে পারব, "রাজকন্যা আমার কাছে আতর কেনে এই কথা শুনে অনেকেই আমার কাছ থেকে আতর কিনবে।"

এসব ভেবে সে সোজা রাজধানীতে চলে গেল। অনেক চেষ্টা করে রাজার কাছে পৌঁছাল। রাজা কয়েকটি আতর পরীক্ষা করে খুশী হয়ে রাজকুমারীকে ডেকে পাঠাল।

রাজকুমারী এসে অতগুলো আতরের শিশি দেখে মহানন্দে একটি শিশি খুলেই ধেই ধেই করে নেচে বলতে লাগল, "হে

হে, কি মজা, চল্লিশ বছর বয়সে আমি আবার বিয়ে করব।”

তার নাচ দেখে সবাই অবাক হল। তার কথা কেউ বুঝতে পারল না। যে শিশিতে পেত্নী ঢুকেছিল রাজকুমারী প্রথমেই ঐ শিশির ছিপি খুলেছিল। শিশি থেকে পেত্নী বেরিয়েই তার ঘাড়ে চড়ে বসল।

রাজা ভীষণ রেগে গিয়ে আমীরকে কয়েদঘরে পুরে দিল। আমীর কয়েদঘরে বসে বসে ভাবল, বনের পেত্নী যখন ঘাড়ে চেপেছে তখন অত সহজে তাকে ছাড়বে না। সে রাজার কাছে খবর পাঠাল, “মহারাজ রাজকুমারীকে আমি সারিয়ে তুলতে পারব। আমাকে একটু সুযোগ দিন।”

রাজা আমীরকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কিভাবে সারাবে? তুমি জানো, ওর কি হয়েছে?”

“জানি মহারাজ, আমি যে শিশিতে একটি পেত্নীকে বন্দী করে রেখেছিলাম দুর্ভাগ্যবশত রাজকুমারী সেই শিশির ছিপি প্রথমে খুলেছে। এখন রাজকুমারীর সঙ্গে আমার যদি বিয়ে হয় আমি তাহলে তাকে নিয়ে বনে যেতে পারি। বনে গেলে ঐ পেত্নী রাজকুমারীকে ছেড়ে আবার কোন গাছে উঠে যেতে পারে।” আমীর বলল।
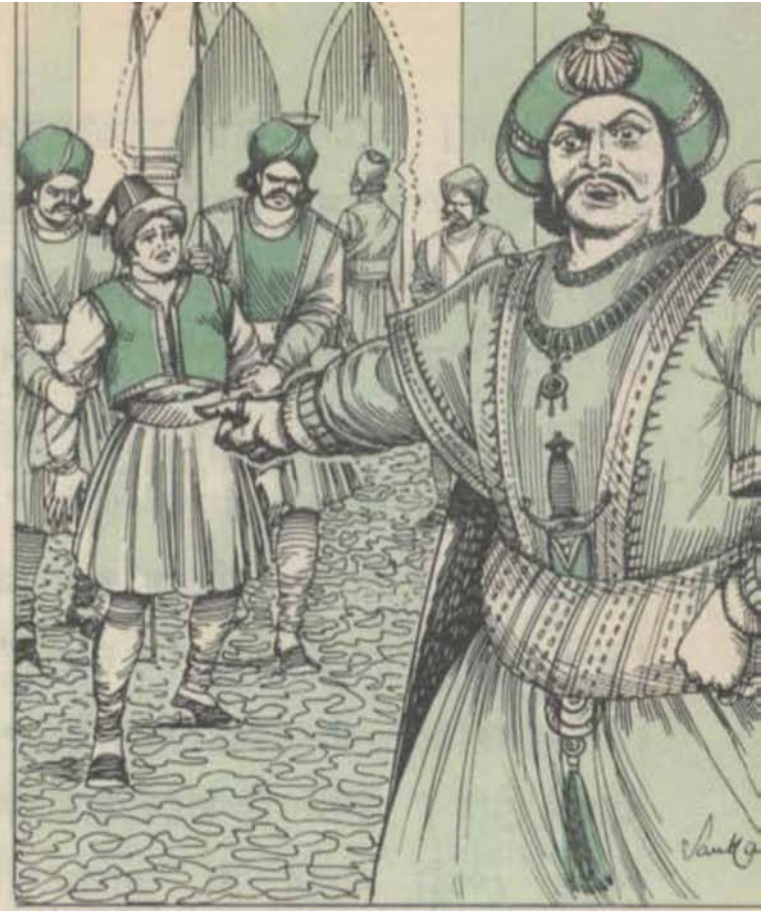
এই কথা শুনে রাজা আগুন হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, “আমীর ইচ্ছে করেই এই সব কাণ্ড করেছে। ওর উদ্দেশ্য ছিল এসব কাণ্ড করে রাজকুমারীকে বিয়ে করা।” তিনি গর্জে উঠে বললেন, “এই কে আছিস? অমাবস্যার দিন একে মৃত্যুদণ্ড দিবি। এখন একে কারাগারে নিয়ে যা।”

আমীর কয়েদঘরে ঢুকে গালে হাত

দিয়ে ভাবল। কয়েদখানার লোকজনের হাতে পায়ে ধরে সে হোসেনের কাছে খবর পাঠাল। খবর পেয়ে হোসেন এসে, সব জেনে রাজার সঙ্গে দেখা করে বলল, "মহারাজ, রাজকুমারীর মাথায় যে পেত্নী চেপেছে আমি তাকে ছাড়াতে পারি।"

রাজা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তুমিও কি তাকে বিয়ে করতে চাও?"

"না মহারাজ, ঐ ধরণের কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি কিভাবে তার ঘাড় থেকে পেত্নী নাবাব তা আপনারাই দেখতে পাবেন। তবে আমার কাজের সময় বাধা দিলে রাজকুমারীর ঘাড় থেকে পেত্নী নাববে না।" হোসেন বলল।

"ঠিক আছে!" রাজা বললেন।

"মহারাজ একটা কাঁচের বড় জার চাই। ঐ জারে রাজকুমারীকে বসানো হবে। জারের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থাও যেন থাকে।" হোসেন বলল।

হোসেনের কথামত জারের ব্যবস্থা হল। ঐ জারে রাজকুমারীকে বসানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী ভীষণ ছটফট করতে লাগল। আসলে এই ছটফটানি ছিল পেত্নীর। পেত্নী ভেবেছে আবার তাকে শিশিতে পুরে ছিপি এঁটে দেওয়া হচ্ছে। তাই ছিপি আঁটার আগেই সে পালিয়ে গেল।

তারপর জার থেকে রাজকুমারীকে বের করা হল। রাজকুমারীর চেহারা ও আচরণ আগের মত হয়ে গেল।

রাজা খুব খুশী হয়ে হোসেনকে প্রচুর উপহার দিলেন। হোসেনের অনুরোধে আমীরকেও তিনি মুক্তি দিলেন।

রাজার কাছ থেকে যে উপহার পেয়েছিল তা খরচ করে হোসেন ও আমীর বিয়ে করে সুখে জীবন কাটাতে লাগল।

চালাকি

রামশাস্ত্রী নামে এক পণ্ডিত ছিল। গিরিনাথ নামে এক ছেলেকে সে পুষল। অনেক বছর পরে রামশাস্ত্রীর একটি ছেলে হল। নিজেব ছেলে হওয়ার পর সে গিরিনাথকে দূর করে দিল না, তবে তার বাড়ির কাজকর্ম তাকে দিয়ে করাতো। গিরিনাথের লেখাপড়া সে বন্ধ করিয়ে দিল। নিজের ছেলেকে সে পণ্ডিত করে ফেলল।

গিরিনাথ খুব ভালো ছবি আঁকতে পারতো।

একবার জমিদার জন্মদিন পালন করল। এই দিনের অনুষ্ঠানে সে চিত্রশিল্পী ও কবিদের আমন্ত্রণ জানাল। রামশাস্ত্রী ছেলেকে নিয়ে ঐ অনুষ্ঠানে গেল। গিরিনাথ গেল তার আঁকা ছবি নিয়ে। জমিদার ছবিগুলো পরীক্ষা করে দেখে এক একজনকে এক একটি জিনিস দিল। ঐ জিনিস দেখিয়ে পরের দিন পুরস্কার নিয়ে যাওয়ার কথা। রামশাস্ত্রীর ছেলে পেল একটি নীল ফুল। গিরিনাথ পেল লাল ফুল। টকটকে লাল ফুল পেয়ে গিরিনাথের দারুণ আনন্দ হল। রামশাস্ত্রী তা লক্ষ্য করল। পরের দিন সকালে রামশাস্ত্রী নিজের ছেলের হাতে ঐ লাল ফুল দিয়ে জমিদারের কাছে পাঠিয়ে দিল। অগত্যা নীল ফুল হাতে নিয়ে গিরিনাথ গেল জমিদারের কাছে।

লাল ফুল দেখেই জমিদারের লোক রামশাস্ত্রীর ছেলেকে চাবুক মারল। আর নীল ফুল দেখে গিরিনাথকে দিল সোনার মুদ্রা।

ইনি কে? ইনি কি সত্যিই কৃষ্ণ?
না ঠগবাজ কেউ?

তোমার কাছে কেন এসেছেন উনি ...আনন্দ

...না কি তোমার কল্পনা...

...স্বপ্ন...না কি তোমার নিজের আরেক মন...

কি চান উনি তোমার কাছে আনন্দ?

বি নাগি রেড্ডীর ছবি
—যেখানে
ক্যামেরা রয়েছে
মানুষের মনের কাছাকাছি—

এ্যাহি হ্যায় জিন্দগী

ইস্টম্যানকালার

মানুষের মনের গভীরের ছবি—
তার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব

পরিচালনা : কে এস্ সেতুমাধবন সংলাপ : ইন্দ্ররাজ আনন্দ
গীতরচনা : আনন্দ বক্সী সঙ্গীত : রাজেশ রোশন

বিজয়া প্রোডাকশন কৃত
ফিল্ম

লোভের ফল

এক গ্রামে এক ছিল মহাজন। তার নাম ছিল স্বরাজ। অনেক টাকা পয়সা রোজগার করেও তার মন ভরল না। আরও বেশী করে রোজগার করার জন্য সে একটি পরিকল্পনা করল।

একদিন স্বরাজ একটি পনের বছরের ছেলেকে ডেকে বলল, "দেখ, তুমি ভিক্ষে করে যা পাও তার চেয়ে বেশী পাবে।— আমি যা বলছি তা তোমাকে করতে হবে। দুদিন আমার কাছে থাকতে হবে। তুমি যা পাবে তার অর্ধেক তোমাকে আমি দেবো।"

ভিখিরি ছেলেটা স্বরাজের কথামত কাজ করতে রাজী হল। একদিন মাঝ-রাত্রে স্বরাজ "চোর চোর, বাঁচান, বাঁচান" বলে চিৎকার করতে লাগল।

স্বরাজের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা লাঠি ছোরা বল্লম নিয়ে ছুটে এল। ওদের আসার আগেই স্বরাজ খিড়কির দরজা খুলে "চোর ঐ পথে পালিয়েছে" বলে ওদের জানাল। প্রতিবেশীরা অনেকক্ষণ খুঁজে চোরকে না পেয়ে স্বরাজকে অভয় দিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেল।

প্রতিবেশীরা যখন চোরকে খুঁজছিল তখন ঐ ছেলেটি প্রতিবেশীদের ঘর থেকে জিনিসপত্র চুরি করে পালিয়ে এল।

পরে দরজা জানালা বন্ধ করে ছেলেটা যা এনেছিল তা দেখে অবাক হয়ে আনন্দে বলল, "এগুলো আনার সময় তোমাকে কেউ দেখে ফেলেনি তো ?"

রতন শেঠ

স্বরাজের প্রশংসা শুনে ভিখিরি ছেলেটা উৎসাহিত হয়ে বলল, "কে আর দেখবে। সবাই তো আপনার কথামত ছোটাছুটি করছিল। এবার আমার ভাগ আমাকে দিন।"

স্বরাজ জিভ কামড়ে বলল, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। এখন তোমাকে তোমার ভাগ দিলে তুমি কোথায় রাখবে? তার চেয়ে দুদিন পরে তোমাকে একসঙ্গে দিয়ে দেব, তুমি তা নিয়ে দূরে পালাবে। এখন এই নাও।" বলে তার হাতে দুটো টাকা দিয়ে স্বরাজ শোবার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন মাঝরাত্রে স্বরাজ আবার "চোর চোর" বলে চিৎকার করল। যথারীতি প্রতিবেশীরা ছুটে এল। প্রতি-বেশীরা এসে দেখল স্বরাজ চোখ বুজে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করছে বিছানায় শুয়ে।

প্রতিবেশীরা বুঝতে পারল স্বরাজ স্বপ্ন দেখছে। আগের দিন রাত্রে যা ঘটে গেছে তাতে স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক ভেবে ওরা স্বরাজকে সাহস দিয়ে বলল, "অত ভয়ের কি আছে চুরিহচ্ছে যখন আমাদের
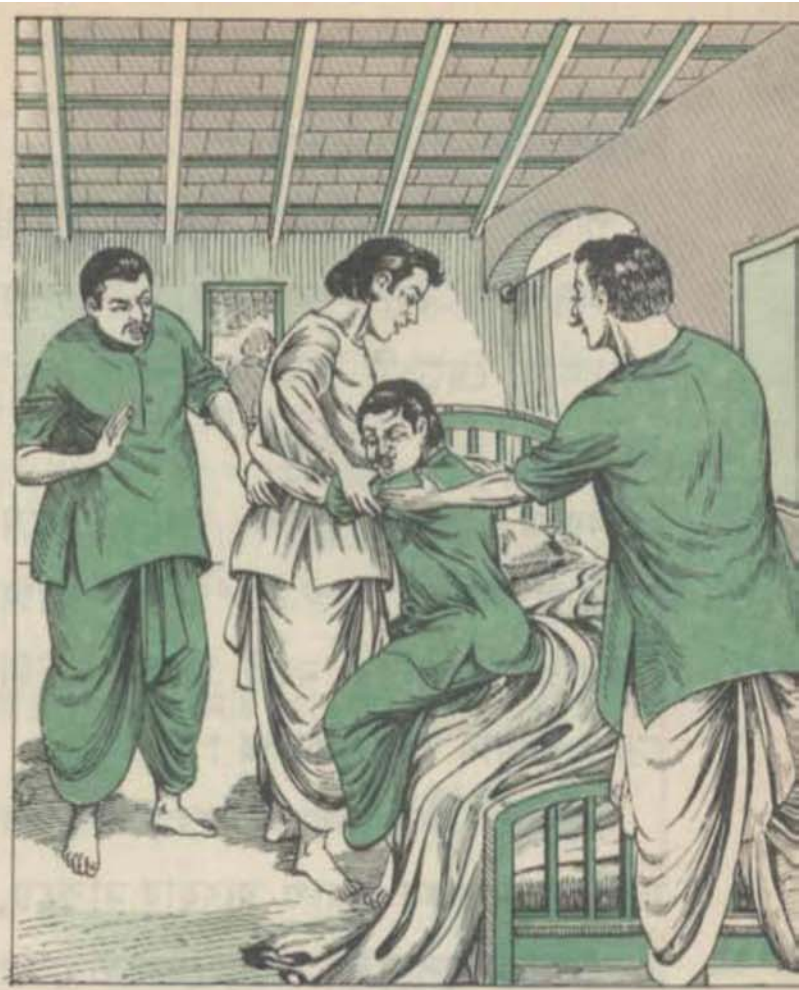
একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কাল থেকে সারারাত পাড়ায় পাহারার ব্যবস্থা করা হবে। কালকে চোর খোঁজার সময় আমাদের অনেকের বাড়িতে কিছু কিছু জিনিস চুরি হয়েছে। যান ঘুমান" বলে ওরা যে যার বাড়ি ফিরে গেল।

ওদের চলে যাওয়ার পর ছেলেটি স্বরাজের কাছে এসে বলল, "দুদিন হয়ে গেছে। এবার আমার ভাগ আমাকে দিয়ে দিন।"

শুনে হেসে স্বরাজ বলল,"কাল শহরে গিয়ে জিনিসগুলো বিক্রি করে তোমাকে

অর্ধেক টাকা দিয়ে দেবো।”

পরের দিন স্বরাজ শহরে গিয়ে জিনিসগুলো বিক্রি করে বাড়ি ফিরল। যথাসময়ে ছেলেটি স্বরাজের সঙ্গে দেখা করে তার ভাগ চাইল।

স্বরাজ তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, “কে রে তুই? ব্যাটা ভিখিরি ভিখিরির মতই থাক। ব্যাটা তোর আবার ভাগ কিসের?”

ছেলেটা কোন কথা না বলে, স্বরাজের সঙ্গে কোন রকম খারাপ ব্যবহার না করে, এককোণে বসে রইল। সে দেখতে পেল স্বরাজ ঐ টাকা পূজোর ঘরে একটি পাত্রে রেখে দিল।

ছেলেটি মনে মনে ঠিক করল, যে কোনভাবে ঐ টাকা আদায় করতে হবে। সেদিন রাত্রে সে একটি গাছের নীচে ঘুমোল। অদূরে কয়েকজনকে ফিসফিস করে কথা বলতে শুনল। কাছে গিয়ে বুঝল ওরা চোর। স্বরাজ যা করেছে তা ছেলেটা ওদের বলল। স্বরাজের ঘরে কোথায় কি আছে সব ঐ চোরদের জানিয়ে দিল।

এত ভালো সন্ধান পেয়ে চোরগুলো আর এক মুহূর্ত দেরি না করে স্বরাজের ঘরে ঢুকল। চোর দেখে স্বরাজ আর্তনাদ করে উঠল।

প্রতিবেশীরা ভাবল স্বরাজ আগের মতই স্বপ্ন দেখছে। চোরগুলো স্বরাজের বাড়ির সমস্ত জিনিস ধুয়েমুছে নিয়ে গেল। ফেরার সময় ওরা ভিখিরি ছেলেটাকে কিছু দিয়ে গেল।

স্বরাজের উপর প্রতিশোধ নিতে পেরে ছেলেটা খুশী হল।
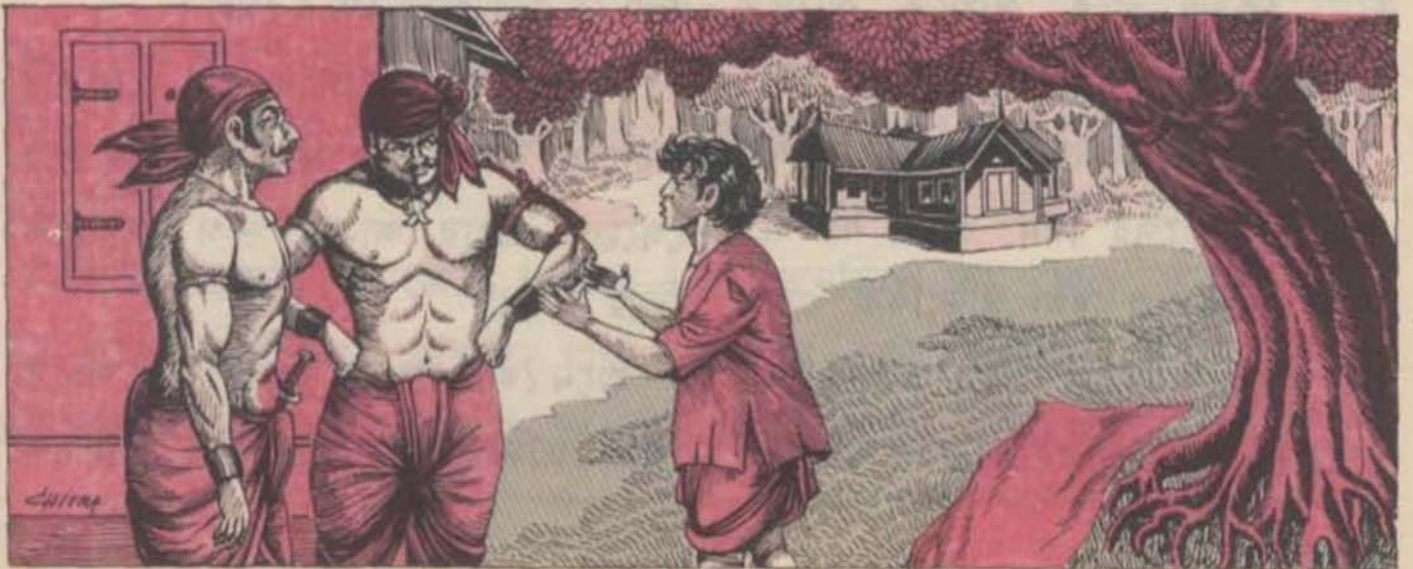
ভাঁড়ের দুঃখ

একবার রত্নগিরির রাজা রাজসভায় সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। সেই সারিতে রত্নগিরির রাজার ভাঁড়ও বসেছিল। পরিবেশক সকলের পাতে মিষ্টি দিয়ে ভাঁড়ের পাতে দিতে ভুলে গেল। তখন ভাঁড় রাজা রত্নপালের দিকে তাকিয়ে বলল, "মহারাজ, কিছুক্ষণের মধ্যেই যদি আকাশে মেঘ জমে যায়, মুষুল-ধারে বৃষ্টি নামে আর আপনাদের সকলের মাথায় বাজ পড়ে তাহলে কি হবে?"

"আমাদের সকলের মাথায় বাজ পড়বে আর তুমি বেঁচে যাবে? রত্নগিরির রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

"তা যাব মহারাজ। কারণ সকলের পাতে মিষ্টি পড়ল আর আমার পাতে পড়ল না।" ভাঁড় বলল।

হেসে রাজা রত্নগিরি পরিবেশককে ডেকে ভাঁড়ের পাতে মিষ্টি দিতে বললেন।
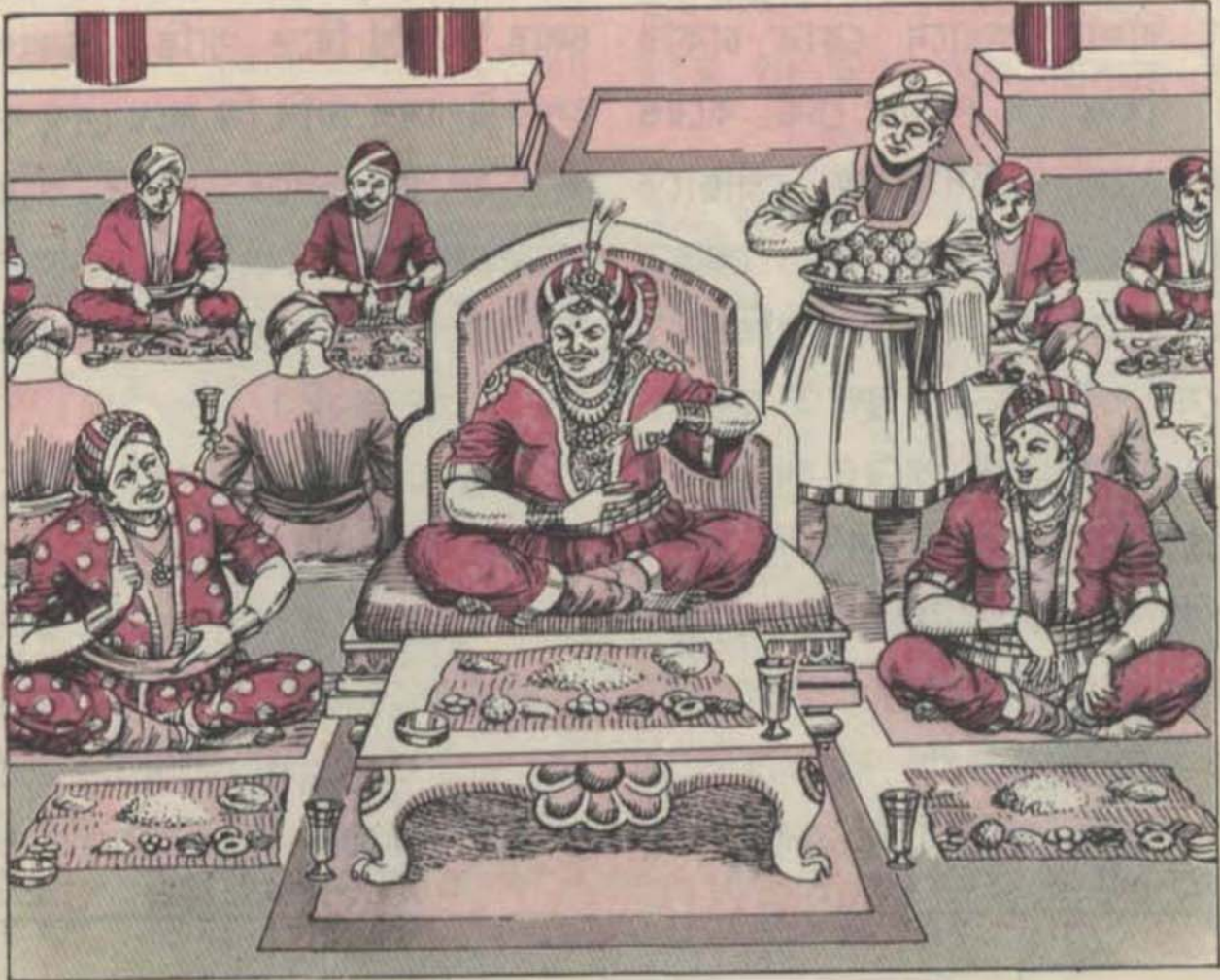
ভালো মানুষ

শান্তি নামে একজন যুবক অনেক শাস্ত্র পড়ে জীবিকার আশায় রাজধানীতে গেল। রাজধানীর নাম মণিপুর। তার ইচ্ছা, রাজার অধীনে কোন চাকরি করা। কিন্তু সে অনেক চেষ্টা করেও রাজপ্রাসাদের ত্রিসীমানায় পৌঁছাতে পারল না। পথে পথে বাধা। ভেতরে ঢুকতে গেলে চাই ঘুষ। কে পণ্ডিত কে মুর্খ সেটা বড় কথা নয়। ঘুষটাই আসল।

সে অনেক চেষ্টা করেও যখন রাজার কাছে পৌঁছাতে পারল না তখন ভাবল, "সোজা আঙুলে তো ঘি উঠবে না, এবার আমি আঙুলটা বাঁকা করি। সৎপথে যখন হবে না তখন অসৎপথ না ধরে উপায় কি?" কিন্তু কোন কিছু করার আগে তার ইচ্ছে করল গুরুর উপদেশ নেওয়ার। সে গুরুর কাছে সব জানাল।

"দেখ শিষ্য, আমি তোমাকে সৎপথে চলার উপদেশ দিতে পারি। অসৎপথে চলার উপদেশ আমি কি করে দেব, বল? তবে সৎপথে চলতে চলতে অনেকে অসৎপথে চলতে বাধ্য হয়। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ অসৎ পথে চলে যায়।" গুরু বলল।

"আমিও এবার অসৎ হব। আমি চোর ডাকাত হয়ে জীবনযাপন করব। আর সৎপথে চলা যাচ্ছে না।" শান্তি বলল।

মাথা নেড়ে গুরু বলল, "কিন্তু তুমি তো বাবা সে শিক্ষা এখনও পাওনি। তুমি যা শিখেছ তাতে মানুষের মঙ্গল

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

হবে। মানুষের অমঙ্গল করার মত তো কিছু শেখোনি। তবু তোমার যখন ইচ্ছে করছে, করে দেখ কি হয়।”

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শান্তি একটি বাড়িতে ঢুকতে গেল চুরি করতে। অনেক সাবধানে এগিয়ে দেখতে পেল ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলছে। ঘরের ভেতরে স্বামী স্ত্রী কথা বলছে। বাড়ির কর্তা বউকে বলছে, “যাই হোক, পাওনাগণ্ডা সব আদায় হয়ে গেছে। দশহাজার মুদ্রা সংগ্রহ হয়েগেছে, আর আমার ভয় নেই। এবার আমি মেয়ের বিয়ে দেব। নাও ধর, এই দশহাজার মুদ্রার পুঁটলিটা তোমার কাছে যত্ন করে রাখ।”

শান্তি আড়াল থেকে দেখতে পেল তার বউ স্বামীর হাত থেকে পোঁটলাটা নিল। একজায়গায় রেখে দিল সে। তখন শান্তি ভাবল, এই মুদ্রা যদি আমি চুরি করিবেচারার মেয়ের বিয়ে হবেনা। শেষে সেই অভিশাপ আমার ঘাড়ে পড়বে। তার চেয়ে কোন বড়লোকের বাড়িতে চুরি করা অনেক ভালো।”

তারপর সে অন্য এক বাড়ির দিকে যাবে, ঠিক সেই সময় সে দেখতে পেল আর একটা চোর সেদিকে আসছে। অত রাত্রে পা টিপে টিপে আসতে দেখে

শান্তি বুঝল যে সে চোর। শান্তি ঘাপটি মেরে সেখানে বসে পড়ল। চোর ঐ ঘরের আলো নিভে যাওয়ার পর ঘরের ভেতরে ঢুকল। ঢুকে ঐ চোর সেই পোঁটলাটি নিয়ে বেরোতেই শান্তি তাকে ধরে হঠাৎ ফেলে "চোর চোর" বলে চিৎকার করতে লাগল।

শান্তির পরিকল্পনা ছিল চুরি করা। চুরি করা তো দূরের কথা সেই চোর ধরতে অত রাত্রে সে একা এগিয়ে গেল।

সবাই উঠে পড়ল। চোর ধরা পড়ল। চোরকে রাজার প্রহরীদের হাতে তুলে দেওয়া হল।

সাক্ষী হিসাবে ডাক পড়ল শান্তির। শান্তি বলল, "আমি অনেক শাস্ত্র পড়েছি। এছাড়া আমার অন্য কোন পরিচয় নেই। এখনও কোথাও কোন চাকরি পাইনি। অত রাত্রে একজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে আমার সন্দেহ হল। আমি বাইরে অপেক্ষা করে চোর বেরোতেই ঝাপটে ধরে ফেলে চিৎকার করেছিলাম।"

সবকথা শুনে রাজা শান্তির প্রশংসা করলেন। তিনি যে শুধু তাকে প্রচুর উপহার দিলেন তাই নয়, তার উপযুক্ত একটি চাকরিও দিলেন।

চাকরি পেয়ে শান্তি গুরুর কাছে গিয়ে বলল, "গুরুদেব, আপনার কথাই ফলল। আমি চুরি করতে পারিনি। তবে আর একজন চুরি করতে যাওয়ায় আমি তাকে ধরতে পেরেছি। ওকে ধরতে পেরে রাজার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি। রাজা আমার কাজে প্রশংসা করলেন। আমাকে আমার উপযুক্ত চাকরিও তিনি দিলেন।

পণ্ডিত ও চোর

কৃষ্ণদেবরায় পণ্ডিতদের সমাদর করতেন। একবার এক পণ্ডিত তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে এক হাজার মুদ্রা পুরস্কার পেয়েছিলেন। রাজধানীতে ঐ পণ্ডিতের পরিচিত কেউ ছিলেন না। তাই তিনি সেই রাত্রিটা রাজধানীর একটি ধর্মশালায় উঠলেন। ধর্মশালায় তাঁর পা রাখার কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই জেনে গেল যে তিনি রাজার কাছ থেকে এক হাজার মুদ্রা পেয়েছেন।

সেদিন রাত্রে ঐ পণ্ডিত আর চারজনের মত এক কোণে মাদুর পেতে শুয়ে পড়লেন। তাঁর মাদুর পাতার সঙ্গে সঙ্গে পাশেই আর একজন মাদুর পেতে শুলো। পাশের লোকটি ছিল চোর। আশেপাশে আরও অনেক মাদুর পড়লো।

মাঝ রাত্রে চোর পণ্ডিতের বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে দেখল কিছুই নেই। সারারাত জেগে চোর পণ্ডিতের গোটা শরীর খুঁজে ফেলল। কিন্তু সে কিছুই পেল না।

চোর অবাক হল। তার কৌতূহল জাগল এক হাজার মুদ্রা পণ্ডিত কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা জানার। শোওয়ার আগে পণ্ডিত চোরের বালিশের তলায় পোঁটলাটি রেখে দিয়েছিলেন। ভোরবেলা পণ্ডিত উঠে চোরের বালিশের তলা থেকে ঐ পোঁটলাটি তুলে নিয়ে চলে গেল।

ধর্ম দেবতা

পৃথিবীতে সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদীদের প্রতি ধর্মদেবতা কি ধরণের বিচার করছেন তা জানার আগ্রহ জাগল পার্বতীর। পার্বতীর ইচ্ছা পূরণের জন্য শিব তাঁকে বিজয়পুর যেতে বললেন।

বিজয়পুরের রাজা ছিলেন অমরসেন। অমরসেনের রাজপ্রাসাদে বিবেকবর্মা নামে এক উন্নতিরাধিকারী ছিল। সে ছিল উন্নতমানের সত্যবাদী।

বিবেকবর্মা নীতিপরায়ণ ও সত্যবাদী হওয়ায় তার অধীনে কর্মচারীরা নীতিহীন বা মিথ্যাবাদী হতে পারেনি। অন্য এক অধিকারীর নাম ছিল সুরেন্দ্রবর্মা। তার কাছে নীতি বলে কোন বস্তু ছিল না। মিথ্যা বৈ সত্য কথা সে বলত না। সে সবসময় চেষ্টা করত বিবেকবর্মার চাকরি খাওয়ার। কি করলে যে বিবেকবর্মার চাকরি খোয়ানো যায় তা সে রাতদিন ভাবতো। অসৎ উপায়ে রোজগার করে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা একটি পাত্রে রেখে সেই পাত্র সুরেন্দ্রবর্মা বিবেকবর্মার বাড়ির পেছনের দিকে পুঁতে রাখল।

তারপর রাজার কাছে উড়ো চিঠি যেতে লাগল। প্রত্যেকটা চিঠির বয়ান, "বিবেকবর্মা ঘুষখোর। প্রত্যেকের কাছে স্বর্ণমুদ্রা নেয়। বাড়ির পেছনের দিকে মাটির নীচে সে স্বর্ণমুদ্রাগুলো পুঁতে রাখে।"

চিঠি পেয়ে রাজা অনুচরদের নিয়ে বিবেকবর্মার বাড়ির পেছনের দিকে হাজির হলেন। রাজাকে দেখে বিবেক-

গণহরি সমাদ্দার

বর্মা অবাক হলেন। রাজা তাঁর আসার কারণ জানিয়ে তাঁর লোককে বাড়ির পেছনের মাটি খুঁড়তে বললেন। মাটি খুড়ে একটি পাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু সেই পাত্রে ছিল ইটপাটকেল।

বিবেকবর্মা বুঝল তাকে অপদস্ত করার জন্য কেউ একাজ করেছে। সে যা বুঝল তাই রাজাকে বলল।

সুরেন্দ্রবর্মার দলের লোকমাঝরাত্রে মাটি খুঁড়ে পাত্রটি রেখেছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে চোর সেই দৃশ্য দেখে পরে সোনা চুরি করে নিয়ে গেল। সোনা তুলে নিয়ে চোর ঐ পাত্রে ইটপাটকেল রেখে দিয়েছিল।

পার্বতী লক্ষ্য করল ধর্ম দেবতা কিভাবে বিবেকবর্মাকে বাঁচিয়েছে। এদিকে সুরেন্দ্রবর্মার চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় সে আরও মরীয়া হয়ে উঠল। রাতদিন ভেবে বিবেকবর্মাকে জব্দ করার জন্য আর একটি পরিকল্পনা করল।

একদিন রাত্রে সুরেন্দ্রবর্মার দুজন অনুচর সস্ত্রীক এল। ওদের স্ত্রীদের গায়ে অনেক গয়নাগাটি ছিল। ওরা তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে এসে বিবেকবর্মাকে সবিনয়ে বলল, "আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে উপকার করুন। আমরা অনেকদূরের যাত্রী। আজ রাত্রে ধর্মশালায় কাটাচ্ছি।

চাঁদমামা

সংস্থাপক : চক্রপাণি

নিয়ন্ত্রণ : বি. নাগি রেড্ডি

'সোনা তৈরির কৌশল' পড়লেই জানা যাবে কিভাবে সোনা তৈরি করা যায়। অনেকে মানুষ চেনে না টাকা চেনে। টাকার লোভ বেশী হলে যে কি ধরণের বিপদে পড়তে হয় তা জানা যাবে 'টাকার চাহিদা' কাহিনী পড়ে। শিক্ষার উপর সবকিছু নির্ভর করে। বাচ্চা বয়সে যে কুশিক্ষা পায় সে বড় হয়ে কুকাজ করে। কে পারে কোন্ ধরণের কাজ করতে তা জানা যাবে 'ভালোমানুষ' কাহিনী পড়ে। লোভী মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। লোভ এমন একটা জিনিস যার সীমা নেই। 'লোভের ফল' কাহিনীতে স্বরাজ কি পারল শেষরক্ষা করতে ?

খণ্ড ৫ এপ্রিল ১৯৭৭ সংখ্যা ১০

প্রতি সংখ্যা ১.২৫ বাৎসরিক চাঁদা ১৫.০০

আমাদের কাছে অনেক সোনারূপা আছে। তাই আমাদের এই জিনিসগুলো আজ রাত্রে আপনার বাড়িতে রেখে দিন।"

বিবেকবর্মা কিছুক্ষণ ভেবে ওদের কাছ থেকে সমস্ত সোনাদানা নিয়ে যত্ন করে একজায়গায় রেখে দিল। যাত্রীদের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রবর্মার লোক রাজার কাছে খবর পৌঁছে দিল ঃ "মহা-রাজ, বিবেকবর্মা আজ রাত্রেই এক পরিবারের কাছ থেকে অনেক সোনাদানা ঘুষ নিয়েছে। আজ রাত্রেই তল্লাসী করলে ওর ঘরে সমস্ত কিছু পাওয়া যাবে।"

খবর পেয়ে রাজা তৎক্ষণাৎ লোকজন নিয়ে বিবেকবর্মার বাড়িতে এসে তল্লাসী করে কিছুই পেলেন না। তখন রাজা বিবেকবর্মাকে ঐ চিঠি দেখালেন। ঐ উড়ো চিঠি পড়ে বিবেকবর্মা রাজাকে বলল, "মহারাজ, এই চিঠিতে যা আছে তা কিছুটা সত্য। রাত্রে মহিলা সহ লোক এসেছিল। সোনাদানা গয়নাগাটি আমার কাছে রেখেছিল। সকালে নিয়ে যাবো বলেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সস্ত্রীক একজন এসে সব নিয়ে চলে গেল।"

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই রাজার লোক সস্ত্রীক একজনকে এনে বলল, "মহারাজ, এদের কাছে অনেক সোনাদানা আছে। বিবেকবর্মাকে অপদস্থ করার জন্যই নাকি সুরেন্দ্রবর্মা এদের ব্যবহার করে। সুরেন্দ্রবর্মাকে ঠকানোর জন্যই নাকি এরা সকালের আগে সোনাদানা নিয়ে পালাচ্ছিল।" এর পর সুরেন্দ্রবর্মার শাস্তি হল। বিবেক-বর্মার উন্নতি হল। পার্বতী ধর্ম দেবতার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন।

বীর হনুমান

রামের মন দুঃখে ভার হয়েছিল। বিভীষণের কথা তাঁর কানে যাচ্ছিল বটে কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। কিছুক্ষণ পরে বিভীষণের দিকে তাকিয়ে রাম বললেন, "বিভীষণ, তুমি হয়ত কিছু বলছিলে, কথাগুলো আমার কানে গেছে কিন্তু কি যে শুনেছি তা মনে পড়ছে না। আর একবার বল তো।"

রামের বক্তব্য শুনে বিভীষণ বলল, "আপনি অহেতুক দুঃখ পাচ্ছেন। আপনার দুঃখ দেখে আমরাও বিচলিত না হয়ে পারিনা। আবার অন্যদিকে আপনার এই দুঃখে ভেঙ্গে পড়া অবস্থা দেখে শত্রু খুশী হচ্ছে। যদি সত্যি রাক্ষসদের বধ করতে চান, সীতাকে উদ্ধার করতে চান, তাহলে শত্রুকে শেষবারের মত আঘাত করার প্রস্তুতি নিন। লক্ষ্মণ বানর সেনাদের নিয়ে যুদ্ধ করুক। আপনি ইন্দ্রজিতকে হত্যা করার সমস্ত রকমের চেষ্টা করুন। ইন্দ্রজিৎ হোম করার জোগাড় করছে। তার এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে আমাদের সকলের মৃত্যু নিশ্চিত। অনেককাল আগে ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার কাছে এক অদ্ভুত বর পেয়েছে। সেই বর অনুসারে সে নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করার পর আর কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। আবার যদি তার

২৯. ইন্দ্রজিতের মৃত্যু

মৃত্যু হয়, এই যজ্ঞের আগে নিকুম্ভি-লাতেই হবে। এই যজ্ঞে যে বাধা দেবে তার হাতেই ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হওয়ার কথা। ইন্দ্রজিতকে হত্যা করতে পারলে যুদ্ধে জয় হতে আর তেমন কিছু বাকী থাকবে না। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু মানে রাবণের মৃত্যু। ইন্দ্রজিতকে হারানোর পর রাবণের যুদ্ধ করার কোন উৎসাহ থাকবে না। আমাদেরও কোন শক্তিশালী শত্রু থাকবে না।"

রাম ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করার দায়িত্ব লক্ষ্মণকে দিলেন। লক্ষ্মণ বীর বানরদের নিলেন, ভল্লুক বাহিনীকেও সঙ্গে নিলেন, আর নিকুম্ভিলার পথ দেখানোর জন্য বিভীষণকে অনুরোধ করলেন। লক্ষ্মণের পাশে ছিল হনুমান।

লক্ষ্মণ সোনার ধনুক ও তীর নিলেন। নিজের শরীরটাকে বিভিন্ন অলঙ্কারে সজ্জিত করলেন। বিভীষণও প্রয়োজনীয় অস্ত্র নিলেন। তারপর ওরা নিকুম্ভিলার দিকে পা বাড়ালেন। সেখানকার প্রহরী দূর থেকেই লক্ষ্মণ ও তাঁর বাহিনীকে দেখতে পেল।

বিভীষণ সেটা লক্ষ্য করে লক্ষ্মণকে বলল, "ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ শেষ হওয়ার আগে বানরসেনাদের দিয়ে রাক্ষসদের হত্যা করানো। সেখানকার সমস্ত রাক্ষস শেষ হয়ে গেলে ইন্দ্রজিৎ এগিয়ে আসবে। তখন ইন্দ্রজিৎ সশরীরে এগিয়ে আসবে। সশরীরে এগিয়ে এলে আপনার পক্ষে ইন্দ্রজিতকে হত্যা করা কঠিন হবে।"

তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণের নেতৃত্বে বানর ও ভালুকসেনা রাক্ষসদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ করল।

রাক্ষসদের আর্তনাদ, বানর ও ভাল্লুকের জয়ধ্বনি শুনে সে যজ্ঞ ছেড়ে উঠে পড়ল।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিকের অবস্থা দেখে রথে চড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদূর যাওয়ার পর বিভীষণ ও লক্ষ্মণ এক ঘন বন দেখতে পেল। সেখানেই ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করছিল। সেখানে একটা কালো ভয়ঙ্কর আকারের গাছ ছিল। অদৃশ্যে যুদ্ধ করার আগে ইন্দ্রজিৎ সেই গাছের কাছে আসে। ঐ গাছের কাছে না এসে সে যুদ্ধে যায় না।

বিভীষণের কাছ থেকে এই গোপন খবর পেয়ে লক্ষ্মণ প্রস্তুত হয়ে ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রথে চড়ে ইন্দ্রজিৎ সেখানে এল।

ইন্দ্রজিতের গাছের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ জোরে জোরে বললেন, "তোমাকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করছি। ক্ষমতা থাকে তো এসো।"

ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের কথা শুনে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেল বিভী-ষণকে। বিভীষণকে লক্ষ্মণের পাশে দেখে ইন্দ্রজিৎ আবেগে বলল, "বিভীষণ, তুমি তো রাক্ষস। তোমার পরিবারের সম্মান আছে। সম্মানিত পরিবার ছেড়ে তুমি ওদিকে গেলে কি করে? এটা তোমার জন্মস্থান। তুমি আমার বাবার আপন

তুমি আমাদের সবকিছু ছুটে গিয়ে শত্রুকে জানিয়ে দিয়েছ? এত বড় নীচ কাজ তুমি করতে পারলে?"

জবাবে বিভীষণ বলল, "তুমি কি আমাকে চেন না? আমি চিরকাল সত্যানুসন্ধানী। ধর্মের পথে চলি। অধর্ম আমি সহ্য করতে পারিনা। দাদা ধর্মের পথে থাকলে আমি তাকে ছাড়তাম না। তোমার বাবার চরিত্রে সমস্ত রকমের খারাপ স্বভাবগুলো আছে। আর বেশী দেরী নেই, কিছুদিনের মধ্যেই লঙ্কার রাক্ষস শেষ হয়ে যাবে। তোমার বাবাও বাঁচবে না। তোমারও দিন এগিয়ে এসেছে। আমাকে যা যা বলার ইচ্ছে করছে বলে নাও। তুমি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যাবে। তাই তোমাকে কিছু খারাপ কথা বলতে চাই না। নকল সীতাকে মেরে তুমি রাম-লক্ষ্মণকে অপমান করেছ। এই অপমানের প্রতিশোধ তাঁরা নেবেন। এখন তুমি লক্ষ্মণের হাতে মরবে।"

ভাই। তোমার কাছ থেকে এই বিশ্বাসঘাতকতা আশা করা যায় না। তোমার মধ্যে ন্যায়-নীতি-ধর্ম কিছুই কি নেই? রক্তের সম্পর্কও তুমি অস্বীকার করছ? শত্রুর অধীনে দাসানুদাস হয়ে চলাফেরা করতে তোমার ভালো লাগছে? তোমার বন্ধুরা তোমার এই অবস্থা দেখে কি কাঁদবে না? অনেকেই তোমাকে গালাগাল দেবে। আপনজনের মধ্যে তোমার কতবড় সম্মান ছিল। শত্রু তোমাকে এখন হয়ত খাতির করছে কিন্তু একদিন তুমি অবহেলিত হবে। আমাকে জব্দ করার জন্যই কি

"মৃত্যুর পর তোমার কাজ হবে যমদূতদের সেবা করা।" তারপর ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেদিন আমার হাতে এতগুলো তীর খেয়েও আবার

এসেছ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ? না, তোমার দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মরার আগে মতিভ্রম হয়। সেটাই এখন তোমার হয়েছে।"

"চোরের মত অদৃশ্যে থেকে যুদ্ধ করাটা বীরত্বের নয়। তুমি বীর হলে তা করতে না। ক্ষমতা যদি থাকে এখন তা দেখাও।" লক্ষ্মণ বললেন।

হঠাৎ ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের উপর তীর নিক্ষেপ করল। লক্ষ্মণের সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই লক্ষ্মণও তীর ছুঁড়লেন। দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ তীর ছোঁড়াছুঁড়ি হল।

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ইন্দ্রজিতের মুখে ভয়ের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। তা লক্ষ্য করল বিভীষণ। মহানন্দে লক্ষ্মণকে বিভীষণ বলল, "মনে হচ্ছে ইন্দ্রজিৎ কাহিল হয়ে পড়েছে। তাকে হত্যা করার এই হল স্বর্ণ সুযোগ।"

লক্ষ্মণ আরও তীক্ষ্ণ, আরও মারাত্মক ধরণের তীর ইন্দ্রজিতের দিকে ছুঁড়লেন। ইন্দ্রজিৎ মূর্ছা গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্দ্রজিতের মূর্ছা কেটে গেল। চোখ খুলেই সে লক্ষ্মণকে দেখতে পেল। দেখেই সে লক্ষ্মণের দিকে তীর নিক্ষেপ করল। তার পরের তীরটি নিক্ষেপ করল বিভীষণের দিকে।

কিন্তু সেই তীরে লক্ষ্মণের কিছু হল না। তিনি বললেন, "এইসব তীর নিয়ে কেউ যুদ্ধ করতে আসে ? এই তীর দিয়ে ইন্দ্রজিৎ আমাকে জব্দ করবে ?" বলে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের দিকে আরও বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করলেন।

লক্ষ্মণের তীরে ক্ষতবিক্ষত হল ইন্দ্রজিতের শরীর। ইন্দ্রজিৎ সত্যিসত্যি কাহিল হয়ে পড়ল। লক্ষ্মণের তীরে ইন্দ্র-

জিতের কবচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

পরমুহূর্তে ইন্দ্রজিতের তীরে লক্ষণের কবচ চূর্ণবিচূর্ণ হল। এইভাবে অনেকক্ষণ ওদের মধ্যে তীরের আদানপ্রদান হল। একে অন্যকে শেষ না করে যেন থামাবে না যুদ্ধ। একজন না মরলে এই যুদ্ধ যেন থামবে না।

যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করে বিভীষণ বুঝতে পারল ইন্দ্রজিতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি রাখতে হবে। বিভীষণ বানরবাহিনীকে বলল, "হে বানরবীরগণ, রাবণের একমাত্র ভরসা এই ইন্দ্রজিৎ। অন্য রাক্ষসের মত ইন্দ্রজিৎও একটি রাক্ষস। এর আগে কত রাক্ষসকে তোমরা মেরে ফেলেছ। এর বেলায় এত ভয়ের কোন কারণ নেই। এও মরবে। এ মরে গেলেই রাবণের পক্ষে যুদ্ধ করার আর কেউ থাকবে না। ইন্দ্রজিতকে আমিই মেরে ফেলতাম। কিন্তু সে আমার ভাইপো। ভাইপোকে নিজের হাতে মারতে ইচ্ছে করছে না। যেসব রাক্ষস ইন্দ্রজিতকে সাহায্য করছে তোমরা তাকে শেষ করে ফেল।"

এই কথাগুলো শুনে বানরবাহিনী মহা উল্লাসে ধ্বনি দিল। তারপর বিভীষণ ও তার অনুচর সহ সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল রাক্ষসবাহিনীর উপর।

ইতিমধ্যে লক্ষণ ইন্দ্রজিতের রথের সারথির মাথা উড়িয়ে দিলেন। অগত্যা ইন্দ্রজিৎ নিজেই রথ চালিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্রজিতের চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। তার মুখে দম্ভের চিহ্ন ছিল না। তার ঐ অবস্থা দেখে বানরগুলো ধ্বনি দিচ্ছিল।

প্রমাথী, সরভ, রভস ও গন্ধমাদন নামে চারটি বীর বানর ইন্দ্রজিতের রথের চারটি

ঘোড়ার উপর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঐ চারিটি ঘোড়াই মরে গেল।

এই অবস্থায় ইন্দ্রজিৎ রথ থেকে মাটিতে নেমে লক্ষণের দিকে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল। সে তাদের বলল, "তোমরা যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যাও। নগরে ঢুকে অন্য রথ নিয়ে আসছি।"

ইন্দ্রজিতের যে কথা সেই কাজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল ইন্দ্রজিৎ ভালো রথের উপরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে।

এবারে ইন্দ্রজিৎ অসংখ্য তীর নিক্ষেপ করল বানরবাহিনীর উপর।

শেষে লক্ষণ ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করে ইন্দ্রজিতের মুণ্ডু কেটে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণ ও বানরদের সে কি আনন্দ। আর ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যেসব রাক্ষস এতক্ষণ প্রবলবিক্রমে যুদ্ধ করছিল তারা শোকে মুহ্যমান হয়ে ফিরে গেল।

ইন্দ্রজিতের মুণ্ডু মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণ মহানন্দে ফিরে গেলেন রামের কাছে, তাঁকে নমস্কার করলেন। রাম ভাইকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হওয়া মানে রাবণের ডানহাত ভেঙ্গে যাওয়া।"

রাবণ জানতে পারল বিভীষণের সাহায্যে লক্ষণ ইন্দ্রজিতকে হত্যা করেছে। খবরটা শুনেই রাবণ অজ্ঞান হয়ে গেল।

"আমি আসল সীতাকেই রামের চোখের সামনে মেরে ফেলব।" বলে খাপ থেকে তরবারি বের করে দৃপ্ত পদক্ষেপ রাবণ অশোকবনের দিকে এগিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রাবণের মন্ত্রীগণ বলল, "আপনার রাগ আপনি রামের উপর দেখান। সীতাকে মেরে ফেলে কি হবে।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসংখ্য ভারতীয় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। শহীদ হয়েছিলেন। সেইসব মহান শহীদদের মধ্যে বাঘা যতীনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য। ১৮৭৯ সালে তাঁর জন্ম।

বাঘ মেরে তাঁর এই বাঘা নাম হয়েছিল। একদিন সকালে গ্রামে বাঘ ঢুকে পড়েছিল। যতীন সাধারণ ছোরা নিয়ে ঐ বাঘকে আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত যতীন বাঘকে মেরে ফেলেছিলেন। তাঁর গায়েও বাঘের থাবা পড়েছিল। বহুদিন হাসপাতালে তাঁকে থাকতে হয়েছিল। ডাক্তাররা

বলেছিল, "একমাত্র মনোবলের সাহায্যেই যতীন এ যাত্রা বেঁচে গেছে।" যতীন যে শুধু বাঘ মেরেছিলেন তাই নয়, ভারতের শোষক বৃটিশ সিংহেরও তিনি মোকাবিলা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কয়েকজন যুবককে নিয়ে গোপন সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

অমরবাণী

ত্যাজ্যম্ ন ধৈর্য্যম্ বিধুরেপি কালে,
ধৈর্য্যাৎ কদাচিৎ গতি পাপ্নুয়াৎ সঃ,
যথা সমুদ্রেপি চ পোতভঙ্গে
সাম্ যাত্রিকো বাঞ্ছতি তর্তুমেব ॥ ॥ ১ ॥

[কষ্টের সময়ে ধৈর্য হারাতে নেই। ধৈর্য থাকলে একদিন না একদিন পথ মেলে। সমুদ্রে যখন জাহাজ ডুবি হয় তখন প্রতিটি যাত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করে পথ খুঁজে পাওয়ার।]

ব্যসনে মিত্র পরীক্ষা
শূরপরীক্ষা রণাঙ্গনে ভবতি,
বিনয়ে ভৃত্যপরীক্ষা,
দানপরীক্ষা চ দুর্ভিক্ষে। ॥ ২ ॥

[কষ্টের দিনে বন্ধুর পরীক্ষা, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর পরীক্ষা, বিনয়ের মাধ্যমে সেবকের পরীক্ষা ও অকালের দিনে দানে পরীক্ষা হয়।]

ন সদশ্বাঃ কশাঘাতম্
ন সিংহা ঘনগর্জিতম্
পরৈ রঙ্গুলিনির্দিষ্টম্
ন সহন্তে মনস্বিনঃ। ॥ ৩ ॥

[ভালো ঘোড়া পড়ে যায় না। সিংহ মেঘের গর্জন সহ্য করে না। আত্মসম্মান-যুক্ত মানুষ অন্যের তর্জণী প্রদর্শন সহ্য করতে পারে না।]

তাঁর নেতৃত্বে সেইসব সংগঠিত যুবক লাঠি চালানো, ছোরা মারা ও বন্দুক চালানো গোপনে শিখেছিল। সেইসব যুবকরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করার শপথ নিয়েছিল। গোপনে তারা যে বৃটিশ বিরোধী কাজ করছে তা জানতে পেরে ফাঁদ পেতে বৃটিশ যতীনকে এ্যারেষ্ট করল।

নানাভাবে যতীনের মুখ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করল বৃটিশ। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও তারা বের করতে পারল না। তখন ধূর্ত সরকার প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়ে কথা বের করতে চাইল। যতীন টেবিল চাপড়িয়ে ধমক দিয়ে ঐ ধরণের কথা উচ্চারণ করতে বারণ করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত কোন কথা বের করতে না পেরে, কোন প্রমাণ না পেয়ে ওরা তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ইতিমধ্যে গোপনে তাঁর দলের লোক জার্মান থেকে অস্ত্র আনার ব্যবস্থা করেছিল। জার্মান তাদের অস্ত্র দিতে রাজী হয়েছিল। একদিন যতীন তাঁর তিনজন বন্ধু সহ নদীর ধারে অস্ত্রবাহী জাহাজের অপেক্ষায় ছিলেন।

এদিকে বৃটিশ সরকারের দুটো জাহাজ ঐ জার্মান জাহাজকে তাড়া করেছিল। এই খবর পেয়ে যতীন সেদিন বন্ধুদের বলেছিলেন, "তাহলে আর আমাদের বিদেশী অস্ত্রের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।"

একদিন যতীন সদলবলে যাচ্ছিলেন। পুলিশ কায়দা করে "চোর চোর" বলে চিৎকার করল। পাড়ার লোক সত্যি সত্যি চোর ভেবে তাদের ধরার জন্য ছুটল। ওদের হাতে ওরা ধরা পড়ল না। শেষে ওদের ধরার জন্য সরকার পুরস্কারও ঘোষণা করে দিল। ছুটতে ছুটতে অনেকদূর ওরা চলে গেল। পথে পড়ে গেল নদী। তখন বাধ্য

হয়ে হাতের বন্দুক উপরে তুলে রেখে সাঁতার কেটে নদী পেরোলেন ওরা। পরবর্তী পরিকল্পনার তোড়জোড় করছিলেন যতীন। কলকাতার গুপ্তচর পুলিশ দিনরাত যতীনকে খুঁজতে লাগল। তাঁকে এবং তাঁর দলের লোককে ধরার জন্য ওরা ওৎ পেতে

ছিল। কিন্তু যতীন ওদের চোখে ধূলো দিয়ে নিজের কাজ করে যেতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ গুপ্তচর ও মিলিটারীর মোকাবিলা করতে হল

বাঘা যতীন ও তাঁর দলকে। উভয় পক্ষের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে গুলি বিনিময় হল। অসংখ্য পুলিশ মারা গেল। যতক্ষণ গুলি ছিল ততক্ষণ যতীনের দল লড়াই করল।

শেষ পর্যন্ত যতীনকে বৃটিশ সরকার ধরে ফেলল। এ্যারেষ্ট হওয়ার রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হল। তিনি ওদের বলেছিলেন, "অন্যদের কোন শাস্তি দেবেন না। যা কিছু হয়েছে তার জন্য আমিই দায়ী।" পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টিগার বাঘা যতীন সম্পর্কে বলেছিল, "আমি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বীরকে দেখলাম।"

গল্পের নামকরণ প্রতিযোগিতা

এই গল্পের ভাল নাম দিয়ে ২৫ টাকা জিতে নিন

?

আরবে হাসান ও আলির মধ্যে একটা ছাগলের ব্যাপারে ঝগড়া বেধে গেল। হাসান বলে, "ছাগলটা আমার।" আলিও তাই বলল। ওদের ঝগড়া হাতাহাতি হওয়ার আগে পাড়ার লোক বিচারের জন্য ওদের কাজীর কাছে পাঠিয়ে দিল।

"তোমাদের ঝগড়া কিসের?" কাজী জিজ্ঞেস করল।

"হুজুর, এই ছাগলটা বরাবর আমার কাছেই ছিল। প্রত্যেকদিন এটাকে আমি খাইয়ে যত্ন করে বড় করেছি। মাত্র কদিন আগে এই ছাগলটা হারিয়ে গিয়েছিল। খুঁজে খুঁজে এটাকে আলির বাড়িতে পেলাম।" হাসান বলল।

আলিও বলল, "না হুজুর, ছাগলটা বরাবর আমার কাছে ছিল। ওটা আমারই।"

তারপর কাজী একবার আলির মুখের দিকে একবার হাসানের মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলল, "দুজন একসঙ্গে থাকলে একজনের প্রভাব আর একজনের উপর পড়ে। যে কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে এটা খাটে। এবার আমি বলছি, সকলে আলির মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখ। ওর মুখটা ঠিক ছাগলের মত দেখতে। অতএব এই ছাগলটা আলির।" এই রায় দিয়ে কাজী নিজের বাহন একটি গাধার পিঠে উঠে পড়ল।

রাগে গজগজ করতে করতে হাসান গাধার পিঠে বসা কাজীর দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যি তো! দুটোর মধ্যে কে যে গাধা বোঝা যাচ্ছে না।"

* * *

এই গল্পের ভালো একটা নাম পোস্টকার্ডে লিখে পাঠাতে হবে। কার্ডের উপরে 'গল্প-নামকরণ প্রতিযোগিতা' লিখতে হবে। কার্ড পাঠানোর ঠিকানা:

Chandamama (Bengali), 2 & 3 Arcot Road, Madras-600 026

পোস্টকার্ড ২০শে এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছানো চাই। এই কার্ডে ফটো নামকরণ লেখা চলবে না। ফলাফল জুন '৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

ফেব্রুয়ারী '৭৭ গল্প-নামকরণ প্রতিযোগিতার ফলাফল

গল্পের নাম: বুদ্ধি যার বল তার

পুরস্কার পেয়েছেন: তুহিন পাল, ১০৭ সত্যেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৪।

ফটো-নামকরণ প্রতিযোগিতা :: পুরস্কার ২৫ টাকা

পুরস্কৃত নাম জুন '৭৭-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হবে

ফটো নামকরণ দু'চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই।

২০শে এপ্রিল, ৭৭-মধ্যে পৌছানো চাই। পরে পৌছানো চিঠি গ্রহণযোগ্য হবে না। জয়ী প্রতিযোগীকে ঐ দুটো নামের জন্য মোট ২৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। দুটো ফটোর নামকরণ একমাত্র পোস্টকার্ডেই লিখে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কার্ডে অন্য কোনো বিষয় লেখা চলবে না।

Chandamama Photo Caption Competetion, Madras-600026

ফেব্রুয়ারী '৭৭ ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম ফটোর নাম : আদর নাই খাবার খাই

দ্বিতীয় ফটোর নাম : খাবার খাই আদর পাই

পুরস্কার পেয়েছেন : ভক্তি সুধা দত্ত রায়
রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির বেসিক স্কুল,
সরিষা, ২৪ পরগণা।

পুরস্কারের ২৫ টাকা এই মাসের মধ্যে পাঠানো হবে।

Printed by B. V. REDDI at Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for CHANDAMAMA CHILDREN'S TRUST FUND (Prop. of Chandamama Publications) 2 & 3, Arcot Road, Madras 600 026 : Controlling Editor : NAGI REDDI

খেতে ভাল দেখতে ভাল ভাবতে ভাল

মিষ্টি ফলার পার্লে পপিন্স

৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর
রাস্পবেরী, আনারস, লেবু,
কমলালেবু ও মুসম্বী।

everest/393/PP-bn

মিত্রলাভ

চুয়াল্লিশ

সরস্বর তীরে চার বন্ধুতে ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছিল। একদিন হঠাৎ চিত্রাঙ্গ এলো না। ওর না আসাতে অন্য বন্ধুদের দুশ্চিন্তা হল। ওরা বলাবলি করল ঃ

"কি হতে পারে ? আসেনি কেন ?",

"কোন সিংহের পেটে যায়নি তো ?"

"কোন শিকারীর ফাঁদে পড়েছে কিনা কে জানে ? একবার ফাঁদে পড়লে ফাঁদ থেকে উঠে আসা তো সহজ নয়।"

শেষে মন্দরক (কচ্ছপ) কাককে বলল, "আমি তো আর আমাদের চিত্রাঙ্গকে খুঁজে বেড়াতে পারবো না। আমাদের ইঁদুর ভায়ার পক্ষেও সারা বন খুঁজে বেড়ানো সম্ভব নয়। অগত্যা তোমাকেই খুঁজে আসতে হবে। তুমি কিছুক্ষণের মধ্যে সারাবন ঘুরে আসতে পার। তুমি একাই যাও।"

ওদের কথায় ললুপতনক (কাক) রাজী হয়ে উড়ে গেল। অদূরেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে আটকে পড়েছিল চিত্রাঙ্গ (হরিণ)। কাক তাকে দেখে দুঃখ পেয়ে বলল, "বন্ধু তোমার একি অবস্থা !"

বিপদে পড়ে বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়ে হরিণের দুঃখ ছাপিয়ে এল ! সে কাককে বলল, "আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে বন্ধু। মারা যাওয়ার আগে আমি যে তোমাকে দেখতে পেয়েছি এ আমার সৌভাগ্য। যে কদিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম, খুব

ভালো ছিলাম। হিরণ্যক ও মন্দরককে আমার কথা বলো।"

তার কথার জবাবে কাক বলল, "বন্ধু, আমি যখন আছি তুমি তখন অত নিরাশ হচ্ছ কেন? আমি এক্ষুনি গিয়ে হিরণ্যককে নিয়ে এখানে আসব। সে কুটুস্ কুটুস্ করে সমস্ত দড়ি কেটে ফেলবে। তুমি মুক্তি পাবে।"

এই কথা বলে কাক ফিরে গেল কচ্ছপ ও ইঁদুরের কাছে। সমস্ত ঘটনা ওদের জানিয়ে ইঁদুরকে পিঠে বসিয়ে তাড়াতাড়ি কাক উড়ে এল সেই হরিণের কাছে।

ওদের দেখে সাহস পেয়ে হরিণ বলল, "তোমাদের মত বন্ধু থাকলে মৃত্যুভয় থাকে না। অনেক কপাল করলে তোমাদের মত বন্ধুকে পাওয়া যায়।"

ইঁদুর বলল, "বন্ধু তুমি তো খুব বুদ্ধিমান। এই জালে পড়লে কি করে?"

"বন্ধু, জালে আমি এই প্রথম পড়িনি। এর আগেও একবার পড়েছিলাম। অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলাম।"

সেবারে যে কিভাবে মুক্ত হতে পেরেছিল তা ইঁদুর জানতে চাইলে হরিণ বলল, "বন্ধু, এখন সেই কাহিনী বলার সময় নয়। যেকোন মুহূর্তে শিকারী এসে যেতে পারে। যত তাড়াতাড়ি পার আমাকে জাল কেটে মুক্ত কর।"

ইঁদুর হেসে বলল, "আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ তোমাকে কোন শিকারী বন্দী অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবে না। তাছাড়া আমার কিছু শাস্ত্রজ্ঞান আছে। কখন যে কিভাবে মুক্তি পেয়েছ তা জেনে রাখা ভালো।"

"বিধির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না। মৃত্যু যখন এগিয়ে আসে তখন বুদ্ধি-

বিভ্রম ঘটে। বড় বড় পণ্ডিতও ভুল করে।" বলে হরিণ তার অভিজ্ঞতার কাহিনী শুরু করল ঃ

অনেক কাল আগের কথা বলছি। তখন আমার বয়স ছিল ছমাস। যেদিকে সেদিকে ছোটাছুটি করতাম। বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতাম। একদিন সদল বলে আমরা যাচ্ছি, সামনে পড়ে গেল শিকারীর জাল। বড়রা একলাফে ডিঙিয়ে চলে গেল। আমিও ওদের দেখাদেখি পেরোতে গিয়ে জালে আটকে পড়লাম।

শিকারী খুব খুশী হয়ে আমার পা বেঁধে দিল। শিকারী ধরে ফেলেছে দেখে সমস্ত হরিণ পালিয়ে গেল।

শিকারী আমাকে মারল না। সে ভাবল আমাকে বিক্রি করে দেবে। যারা হরিণ পোষে তাদের কাছে বিক্রি করে দিলে অনেক পয়সা পাবে। তাই সে বেরিয়ে পড়ল খদ্দের খুঁজতে। ঘুরতে ঘুরতে সে গেল রাজার কাছে। রাজা খুব খুশী হয়ে আমাকে কিনে নিলেন।

রাজবাড়ির মহিলারাও আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে আদরযত্ন করলেন।

বর্ষা এল। বৃষ্টির সময় গাছপালা দেখতে কার না ভালো লাগে। আমার ইচ্ছে করল বনে ফিরে যেতে। আমি একদিন হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "আমি বনে ফিরে যেতে চাই"।

আমার কথা শুনে ওরা ভাবল, আমার উপর ভূত চেপেছে। আমাকে মারতে লাগল ওরা। তখন এক সাধু ওদের বারণ করল। ওরা মারার কারণ জানাল। শুনে সাধু বলল, "হরিণশাবককে তোমরা ছেড়ে দাও।" তারপর ওরা আমাকে স্নান করিয়ে ওষুধ লাগিয়ে বনে এনে ছেড়ে দিল। সেবারের মত মুক্তি পেয়েছিলাম।